শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র

শ্রমিকশক্তি

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা | জানুয়ারী ২০০৯ | বিনিময়: ২ টাকা

মুম্বই হামলা এবং অতঃপর...

আবার সেই যুদ্ধজিগির!

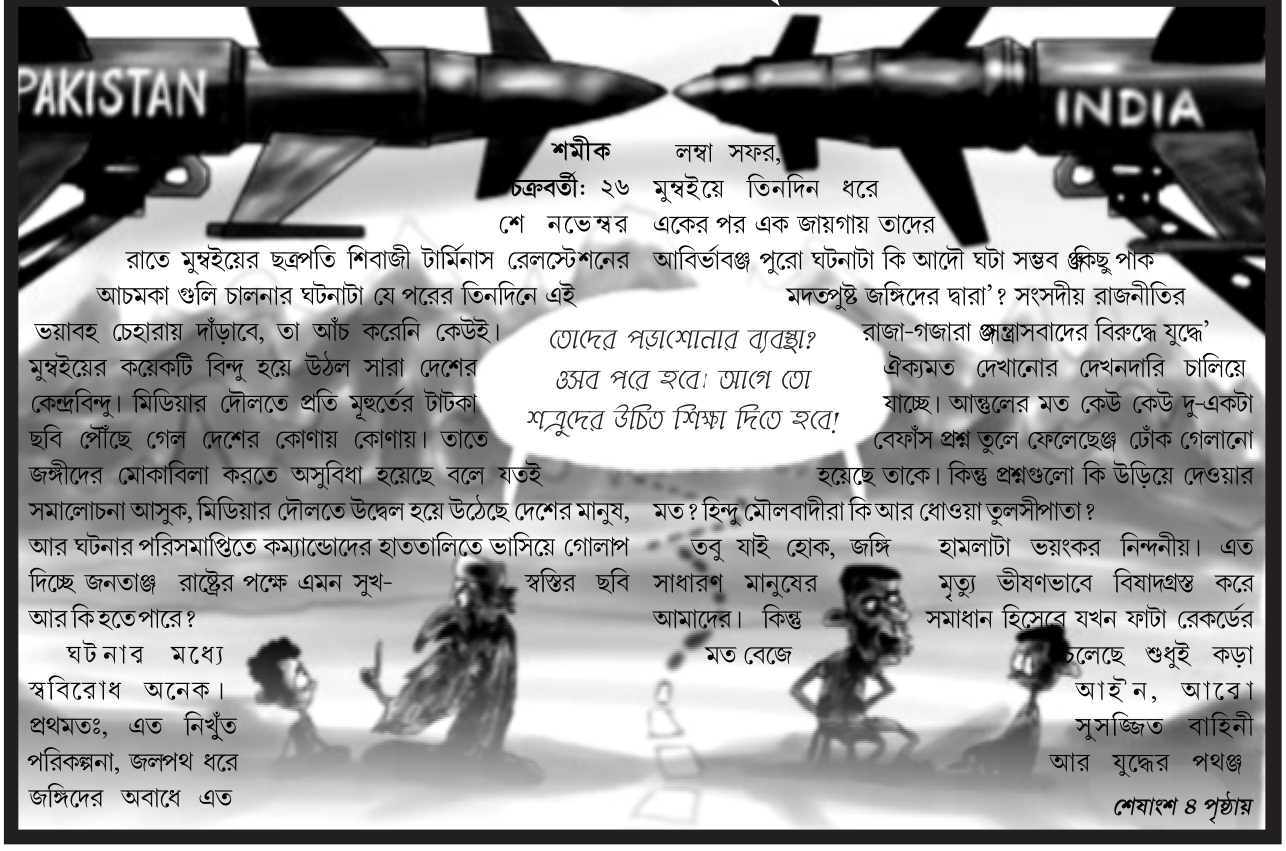

শমীক চক্রবর্তী: ২৬ শে নভেম্বর রাতে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস রেলস্টেশনের আচমকা গুলি চালনার ঘটনাটা যে পরের তিনদিনে এই ভয়াবহ চেহারায় দাঁড়াবে, তা আঁচ করেনি কেউই। মুম্বইয়ের কয়েকটি বিন্দু হয়ে উঠল সারা দেশের কেন্দ্রবিন্দু। মিডিয়ার দৌলতে প্রতি মূহুর্তের টাটকা ছবি পৌঁছে গেল দেশের কোণায় কোণায়। তাতে জঙ্গীদের মোকাবিলা করতে অসুবিধা হয়েছে বলে যতই সমালোচনা আসুক, মিডিয়ার দৌলতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে দেশের মানুষ, আর ঘটনার পরিসমাপ্তিতে কম্যান্ডোদের হাততালিতে ভাসিয়ে গোলাপ দিচ্ছে জনতাঞ্জ রাষ্ট্রের পক্ষে এমন সুখ-স্বস্তির ছবি আর কি হতে পারে?

ঘটনার মধ্যে স্ববিরোধ অনেক। প্রথমতঃ, এত নিখুঁত পরিকল্পনা, জলপথ ধরে জঙ্গিদের অবাধে এত লম্বা সফর, মুম্বইয়ে তিনদিন ধরে একের পর এক জায়গায় তাদের আবির্ভাবঞ্জ পুরো ঘটনাটা কি আদৌ ঘটা সম্ভব ঞ্কিছু পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের দ্বারা'? সংসদীয় রাজনীতির রাজা-গজারা ঞ্সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' ঐক্যমত দেখানোর দেখনদারি চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তুলের মত কেউ কেউ দু-একটা বেফাঁস প্রশ্ন তুলে ফেলেছেঞ্জ ঢোঁক গেলানো হয়েছে তাকে। কিন্তু প্রশ্নগুলো কি উড়িয়ে দেওয়ার মত? হিন্দু মৌলবাদীরা কি আর ধোওয়া তুলসীপাতা?

তবু যাই হোক, জঙ্গি হামলাটা ভয়ংকর নিন্দনীয়। এত সাধারণ মানুষের মৃত্যু ভীষণভাবে বিষাদগ্রস্ত করে আমাদের। কিন্তু সমাধান হিসেবে যখন ফাটা রেকর্ডের মত বেজে চলেছে শুধুই কড়া আইন, আরো সুসজ্জিত বাহিনী আর যুদ্ধের পথঞ্জ

শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায়

গাজায় ইজরায়েলী হানা

ধিক্কার বিশ্বজুড়ে

বিশেষ প্রতিবেদন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউনাইটেড নেশন্স প্যালেস্টাইন অঞ্চলটিকে ইহুদী এবং আরব দেশ-এ(ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইন) ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। তাদের ইচ্ছানুযায়ী ইজরায়েল নামক একটা দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা পেল। আমেরিকা চালিত বিশ্ব বিগত ৬০ বছর ধরে দেশটিকে মদত জুগিয়ে যাচ্ছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সফলভাবেই ইসলাম অধ্যুষিত মধ্য প্রাচ্যে ইসরায়েলকে তার সামরিক ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তুলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইংল্যান্ড-ও এই প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। ইংল্যান্ড জিউস ও আরবের মধ্যে মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়ে দুদিক থেকেই আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে আমেরিকা জিউসদের পক্ষ অবলম্বন করে এবং গায়ের জোরে কিছু জমি দখল করে ইজরায়েল নামক রাষ্ট্র স্থাপন করে। মার্কিনি অর্থ এবং অস্ত্র-এর জোগানে ইজরায়েল ওই অঞ্চলে মার্কিন শক্তি রূপে গড়ে ওঠে। মার্কিন উসকানিতে ইজরায়েল আশপাশের সমস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে নিজের উপস্থিতি জাহির করেছে, যদিও তা ইজরায়েলকে মধ্য প্রাচ্যের একমাত্র শক্তি হিসেবে টিকে থাকতে দেয় নি।

বিগত ৬০ বছর ধরে চলা নির্মম অত্যাচার এবং অর্থনৈতিক অবরোধের পরেও 'গাজা'-র জনগন ইজরায়েল-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়

চটশিল্পে ১৮ দিনের ধর্মঘটের ফলাফল

শর্মিষ্ঠা চৌধুরী: একগুচ্ছ দাবিদাওয়া নিয়ে বিসিএমইউ বাদে সংযুক্ত ইউনিয়নের ছাতার তলায় থাকা অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইউনিয়নগুলি ১লা ডিসেম্বর থেকে চটশিল্পে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়। দাবীদাওয়াগুলোর বেশীর ভাগটাই আপাতদৃষ্টিতে ন্যায্য মনে হলেও, শ্রমিকদের অন্ধকারে রেখে ধর্মঘট ডাকার প্রক্রিয়া ও ধর্মঘট ডাকার আগে কখনো উক্ত দাবীদাওয়াগুলো নিয়ে কোনোরকম আন্দোলনে না যাওয়ার সন্দেহজনক ইতিহাস, লড়াকু শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলনের পরিণতি সম্পর্কে শুরু থেকেই সন্দিহান করে তোলে। হলও তাই। ধর্মঘটের নামে শ্রমিকদের নিশ্চিন্তে বাড়ি বসে থাকার বার্তা পৌঁছিয়ে দিল প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব। সাধারণভাবে প্রায় কোথাওই ধর্মঘট সফল করতে শ্রমিকদের সক্রিয়, স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ দেখা গেল না। সেই উদ্যোগ বিকশিত করার কোন চেষ্টাও দেখা গেল না। হঠাৎ ডাকা এক-আধটা সভায় শ্রমিকরা উপস্থিত হতেন, ধর্মঘট কবে উঠবে নেতাদের মুখে তা শোনার জন্য।

অবশেষে ১৯শে ডিসেম্বর ভোরবেলা শ্রমিকরা শুনলেন যে তাঁদের আবার কাজে যেতে বলা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে মিটিং করে নেতারা ধর্মঘট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিতিতে যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেখানে ফয়সালা হয় যে শ্রমিকদের বকেয়া মেটাতে মালিকরা মাসে অ্যাড হক ভিত্তিতে ৫০০ টাকা করে দেবে, এবং চট শ্রমিকদের সাধারণ দাবিগুলি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি ৮ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে ও সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তর সিদ্ধান্ত নেবে। অর্থাৎ, কোনোরকম দাবী আদায়

শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায়

লালগড়

নতুন পর্যায়ে আন্দোলন

দীর্ঘ ১ মাস ৬ দিন অবরোধ চলার পর লালগড়ে আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। কেউ বলছেন এটা দ্বিতীয় সাঁওতাল বিদ্রোহ। আন্দোলন-কারীরা অবশ্য এই আন্দোলনকে সাঁওতাল বিদ্রোহ বলছেন না। তাঁদের কথায় এটা 'ভূমিপুত্র'-দের লড়াই। 'ভূমিপুত্র'দের মধ্যে যেমন সাঁওতালরা আছেন, আছে কুর্মি, শবর ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ, এমনকি ব্রাহ্মণরাও। এক কথায় এটা 'জনসাধারণের' আন্দোলন। লালগড় থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও পশ্চিমবাংলার সমস্ত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। লালগড়-ঝাড়গ্রাম সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, এমনকি হাওড়া-হুগলীর কিছু কিছু এলাকাতেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

গত ৩রা নভেম্বর '০৮ মুখ্যমন্ত্রী শালবনীতে আসেন পুঁজিপতি জিন্দালের একটি সেজ প্রকল্প উদ্বোধন করতে। তাঁর ফেরার পথে রাস্তায় একটি বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশের সন্দেহ এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে মাওবাদীরা। পরে সি.পি.আই (মাওবাদী) দল এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে। এই ঘটনার পর পুলিশি অপদার্থতা নিয়ে নানান প্রশ্ন ওঠে। পুলিশ কর্তাদের ওপর চাপ দেওয়া শুরু হয়। এরপর পুলিশ বীরপুঙ্গবরা শুরু করে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার। বাঁশবেড়

শেষাংশ ২ পৃষ্ঠায়

উষার শ্রমিকের ওপর সাউথ সিটি মল কর্তৃপক্ষের হামলা

মাথা উঁচু করে বাঁচার কাব্য শম্ভুপ্রসাদ সিংয়ের

শম্ভুপ্রসাদ সিং

সাউথ সিটির বহুতলের মাঝে লড়ে টিকিয়ে রাখা কোয়ার্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের উষা কারখানাকে লোকে বেশী চিনত জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস বলে। এখন সেই উষা কারখানার জমিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সাউথ সিটি নামক বিশাল শপিং মল আর চার-চারটে চল্লিশতলা আবাসন, পাঁচ নম্বরটি তৈরীর অপেক্ষায়। গোটা অঞ্চলটির ঝাঁ-চকচক্েপনায় চাপা পড়ে গেছে সাত হাজার শ্রমিকের কান্না, যারা ঐ কারখানায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছিলেন। ২০০২ সালে উষা কারখানা উঠে যায়। পাওনাগণ্ডা না মিটিয়ে শ্রমিকদের দূর দুর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। উষার কারখানা চত্বরের ভিতরে শ্রমিকদের থাকার জন্য যে কোয়ার্টার গুলো ছিল, সেগুলোকেও রাতারাতি ভেঙ্গে ফেলা হয়। পুলিশ-র‍্যাফ আরো সব বিশেষ বাহিনী দিয়ে ওসব বাড়ি ধুলিসাৎ করে, শ্রমিকদের ১৫০০-২০০০ টাকা ধরিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়। তিনশো কোয়ার্টারের দুশো নিরানব্বইটি ভাঙ্গা পড়ে। ভাঙ্গা যায়নি একটি কোয়ার্টার। উষা সেলাই মেশিন কারখানার শ্রমিক শম্ভুপ্রসাদ সিং থাকতেন সেখানে। অবিবাহিত শম্ভুপ্রসাদের সাথে থাকতেন তার ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, এবং তাদের ছোট্ট ছেলেটি।

গত ২৪ শে ডিসেম্বর রাত নটা নাগাদ সাউথ সিটির কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সিকিউরিটি গিয়ে চড়াও হয় শম্ভু সিং-এর কোয়ার্টারে। তখন বাড়িতে ছিলেন না পুরুষরা। বাড়ির মহিলা ও শিশুদের মারধোর করে হাত পা বেঁধে, ঘুমপাড়ানি ইঞ্জেকশনের ভয় দেখিয়ে তাদের বাড়ি থেকে বের করে এনে ফেলে দেওয়া হয় প্রাক বড়দিনের উৎসবমুখর রাস্তার ফুটপাথে। বাড়ির সমস্ত সামগ্রী ট্রাকে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, ভাঙ্গা শুরু হয় বাড়িটাও।

পরের দিন সকাল থেকে খবর পেয়ে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ জড়ে হয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন, যার জেরে সেদিন রাতে শম্ভু সিংরা আবার ফিরে যেতে পারেন তাঁদের ভাঙ্গাচোরা ঘরে। শাসকদল আর সাউথসিটি মিলে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে রফা করে নেওয়ার চেষ্টা করলেও শম্ভু সিং তার যথাযথ পাওনা ও পুনর্বাসন না পাওয়া পর্যন্ত এই লড়াই চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং সাউথ সিটির জলাভূমি বুজিয়ে বেআইনী নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংঘটিত হচ্ছে।

সম্পাদকীয়
শ্রমিকশক্তি
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জানুয়ারী '০৯

সন্ত্রাস দমন আইন নাকি প্রতিবাদের কন্ঠরোধ ?

আমরা জানি, দুনিয়াজোড়া অর্থনৈতিক সংকটে সাম্রাজ্যবাদ আজ নাস্তানাবুদ অবস্থায়। খোদ আমেরিকাতেই গত সপ্তাহে ২৬ বছরের মধ্যে সর্বাধিক মানুষ বেকারের তালিকাভুক্ত হয়েছেন। ভারতের মতো দেশগুলোতে এর প্রতিফলন একদিকে যেমন ক্রমবর্ধমান কর্মসংকোচন, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে ঘটছে, তেমনই অন্যদিকে শাসকশ্রেণীর তৈরী করা ভারত-পাক যুদ্ধোন্মাদনায় টের পাওয়া যাচ্ছে। এই যুদ্ধজিগিরের মাধ্যমে যেমন অস্ত্র ব্যবসাকে চাঙ্গা করে, জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে সাম্রাজ্যবাদের মুমূর্ষু দেহে অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সঞ্চারিত করা গেছে, তেমনই জীবন-জীবিকা-গণতন্ত্রের সংকটের বিরুদ্ধে যাতে গণপ্রতিরোধ দানা বাঁধতে না পারে, তার জন্য আক্রান্ত মেহনতী মানুষকে উগ্রজাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং এই সার্বিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে অনিবার্য হয়ে পড়ছে কঠোরতম দমনমূলক আইন, যার সাহায্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আইনি ও সামাজিক বৈধতা লাভ করবে।

বলাই বাহুল্য, এই আইনের প্রথম শিকার হবে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সংগ্রামী শক্তি যারা জনগণকে জীবন-জীবিকা-গণতন্ত্রের প্রকৃত সমস্যার বিরুদ্ধে, সমস্যা সৃষ্টিকারী এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সংগঠিত করার চেষ্টা করছে, যারা যুদ্ধ উন্মাদনার বিরুদ্ধে পথে নামছে, যারা সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা জর্জরিত অস্তিত্বকে আরো সমস্যাকীর্ণ করে তুলছে। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে তাকে রাজনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জ করার মতন কোনো শক্তি যাতে সংগঠিত হতে না পারে, তার রক্ষাকবচ এই আইনদ্বয়।

প্রত্যাশিতভাবেই, সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্দ্ধমান সংকটে যারা মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি করতে কসুর করে না, সেই সংসদীয় বামেরাও সংসদে এই আইনকে সমর্থন জানিয়ে আরো একবার প্রমাণ করলো মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদকে অক্সিজেন যোগাতে তারা কতটা যত্নবান। বিজেপি যেমন 'সন্ত্রাস দমনে' আরো কড়া আইন চেয়েছিল, তেমনই ১৮ই ডিসেম্বরের গণশক্তির সম্পাদকীয়তে ধ্বনিত হয়েছে উদ্বেগ, "নিরাপত্তা বাহিনী বা তদন্তকারী দলগুলো যদি সক্রিয় না হয় তাহলে আইন যতই জোরদার হোক তাকে কার্যকর করা হবে কী করে?" অর্থাৎ শুধু কঠোর আইনই যথেষ্ট নয়, চাই কঠোর প্রয়োগ! বস্তুত, দ্রুত ঘনীভূত হওয়া সাম্রাজ্যবাদী সংকটের আঁচ যে জাতীয় - আঞ্চলিক সব দলের গায়েই কম বেশী সমান ভাবে লেগেছে, এবং সকলেই যে প্রাথমিকভাবে এই সংকটের মোকাবিলা করতে চাইছে প্রতিক্রিয়ার উত্থান ঘটিয়ে, তা 'সন্ত্রাস দমন' আইন পাশে তাদের ঐক্যমত্য থেকে স্পষ্ট।

আমরা জানি সাম্রাজ্যবাদ তার সংকটের বোঝা জনগনের কাঁধে চাপাতে সদা তৎপর। এবং তা সে করে শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবেই নয়, শুধুমাত্র ছাঁটাই-মজুরী হ্রাসের মধ্যে দিয়েই নয়, রাজনৈতিকভাবেও সে সংকটের সমাধান চায়। এর এক অন্যতম রূপ হল প্রচলিত গণতন্ত্রে ব্যাপক সংকোচন, যার সাম্প্রতিকতম নিদর্শন সংসদে নজিরবিহীন তৎপরতায় পাশ হওয়া 'সন্ত্রাস দমনে' জোড়া আইন।

জোড়া বিলের মধ্যে একটি জাতীয় তদন্ত সংস্থা গঠন আইন এবং অপরটি ১৯৬৭ সালের বেআইনী কাজ (দমন) আইনের সংশোধনী আইন। বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার ফলস্বরূপ মেহনতী মানুষের ওপর যে নির্মমতম আক্রমণ নেমে আসতে চলেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে এই আইন দুটি কীভাবে কাজ করতে পারে, তা আইন দুটির মূল বয়ান থেকে পরিষ্কার। সংশোধনী আইনটিতে শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে কাুকে আটক করে রাখার সর্বাধিক মেয়াদ ৯০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৮০ দিন করা হয়েছে। গ্রেফতারে পরও চার্জশীট দেওয়ার মেয়াদও বাড়িয়ে ১৮০ দিন করা হয়েছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, গণতান্ত্রিক আইনের মেরুদন্ড যে নীতিটি—অর্থাৎ একজন অভিযুক্ত যতক্ষন না আদালতে দোষী প্রমাণিত হবে ততক্ষন আইনত নির্দোষ বলে গণ্য হবে— সেই নীতিটিকেই উল্টে দেওয়া হয়েছে। এই আইন অনুসারে, 'সন্ত্রাসবাদী হামলার' ক্ষেত্রে কিছু মামুলি সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত অভিযুক্তকে দোষী বলেই গণ্য করবে এবং সে যে নির্দোষ তা প্রমাণ করার দায়িত্ব অভিযুক্তেরই। দোষী প্রমাণ হলে কঠোরতম শাস্তির বিধান আছে। এমনকী অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা যাবে। অর্থসাহায্যের (পড়ুন রাজরোষে থাকা সংগঠনকে পাঁচ টাকা চাঁদা দেওয়া) শাস্তি পাঁচ বছর জেল। অন্যদিকে, জাতীয় তদন্ত সংস্থা আইন অনুযায়ী গঠিত হতে চলেছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংস্থা তৈরী হচ্ছে 'যৌথ ক্ষমতার পরিধি'তে, কেন্দ্র যোগ্য মনে করলে যে কোনো অপরাধ বা মামলারই তদন্ত করতে পারে এই সংস্থাকে দিয়ে। এই সংস্থার আওতায় থাকা মামলার বিচারও হবে বিশেষ আদালতে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, 'সন্ত্রাস দমনে' নতুন আইনে 'সন্ত্রাসে'র সংজ্ঞাকেও এমনভাবে পরিবর্ধিত করেছে সরকার যে যেকোনো সরকারবিরোধী কার্যকলাপকে দেশের ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করার অছিলায় 'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ' হিসেবে কাঠগড়ায় তোলা যেতে পারে। রাষ্ট্রের চোখে যেকোনো সংগ্রামী শক্তি, যেকোনো গণআন্দোলনের মঞ্চ হয়ে উঠতে পারে 'সন্ত্রাসবাদী'। এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ তদারকিতে।

পরিশেষে স্মরণ করা যেতে পারে, রাইখস্ট্যাগ পুড়িয়ে তার দায়ে কমিউনিস্টদের জেলবন্দী করে হিটলার একসময় নিজের পক্ষে জনসমর্থনের জোয়ার তৈরী করতে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষণিকের সেই সমর্থন হিটলারকে বা তার ফ্যাসিবাদকে চিরঅপ্রতিরোধ্য করতে পারেনি। মুম্বই হামলার সুযোগে যারা সাধারণভাবে গণতন্ত্রকামী জনগণের মধ্যেও 'সন্ত্রাসবাদী' আইনের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করতে সচেষ্ট, তারা জনগণের স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক আকাঙ্খার সাপেক্ষে হিটলারের মর্মান্তিকপরিণতির কথা মাথায় রাখতে পারেন।

লালগড়

সরকারী ঘেরাটোপে বাঁধার চেষ্টা প্রশাসনের

অমৃত পৈড়া

লালগড় আন্দোলনে কি হল? 'জনসাধারণের কমিটি'-র পক্ষ থেকে যে ১১ দফা দাবী পেশ করা হয়েছিল তার কি কোনো মীমাংসা হয়েছে? অবরোধ উঠে যাওয়ার পরে পরেই পশ্চিম মেদিনীপুরের এ.ডি.এম. এরণ ইজরায়েলকে ছোটো পেলিয়া গ্রামে পাঠানো হয়। এই ছোট পেলিয়া গ্রামে ঢুকেই পুলিশ তান্ডব চালিয়েছিল। যে তান্ডবে ছিতামনি মুর্মুর চোখ নষ্ট হয়ে যায়। আহত হন আরও বহু আদিবাসী মহিলা। ইজরায়েল গ্রামে গিয়ে কি করলেন? তিনি একটা ডায়েরী নিয়ে মানুষের অভাব-অভিযোগ নোট করলেন। ছোট পেলিয়ার মানুষরা নাকি তাঁর কাছে কুয়ো চেয়েছেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর চাকরী চেয়েছেন, রাস্তা চেয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত ইজরায়েল মহাশয় পনেরো দিনের মধ্যে এসব করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন। হয়তো হবেও এসব। 'সেলফ্ হেল্প গ্রুপ' তৈরী করা, ছাগল মুরগী কেনার ঋণ দেওয়া, অন্নপূর্ণা-অন্ত্যোদয়ের চাল দেওয়া, কয়েক জনের বিপিএল কার্ড করে দেওয়া বা রাস্তা করার নামে কিছু লোকের মাটি কাটার ব্যবস্থা করে দেওয়া - এগুলো প্রশাসন করে দিতেও পারে। যদিও এই সব কর্মসূচির জন্য যে বরাদ্দ টাকা তা থেকে আমলারা চুরি করে। নেতারা, পঞ্চায়েত প্রধানরা, ঠিকাদাররা সকলেই চুরি করে। এই সব প্রকল্প নিয়ে চলে নানা ধরণের পার্টিবাজি। যেমন সিপিএম নেতাদের অনুগত না হলে সেলফ্ হেল্প গ্রুপ করা যাবে না, প্রাইমারী স্কুলে রান্নার কাজ পাওয়া যাবে না, বিপিএল কার্ড হবে না।

পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটির পোস্টার

কিন্তু প্রশ্ন হল যদি এসব পাওয়া যায় তাতে কি গরীব অবেলিত মানুষের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব? এটা ঠিক, লালগড়ের আন্দোলন প্রধানত পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলনে ব্যাপক আদিবাসী সমাজের অংশগ্রহণের অন্যতম কারণ তাদের প্রতি দীর্ঘ দিনের শোষণ-বঞ্চণা। তাদের উপর জাতিগত অবহেলা-নিপীড়ণ। আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষ বার বার এসব কথা তুলে ধরেছেন, এমনকি বুর্জোয়া মিডিয়াও এসব কথা লিখতে বাধ্য হয়েছে। সরকারও একথা বুঝেছে বলেই 'মাওবাদী মাওবাদী' বলে চিৎকার করলেও পুলিশ দিয়ে মেরে ধরে আন্দোলন তোলার চেষ্টা করেনি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে সিপিএম এই শিক্ষা নিয়েছে যে, পুলিশ বা ক্যাডার দিয়ে এই আন্দোলন ভাঙতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

তাহলে এই আন্দোলন ঠেকানোর রাস্তা কি? এই আন্দোলন ঠেকানোর একমাত্র রাস্তা হল একে রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে বেঁধে রাখো। এই আন্দোলন, যা অন্তর্বস্তুতে একটি বিপ্লবী আন্দোলন, সে যাতে বিপ্লবী পথ না ধরে, বিপ্লবী দাবী না তুলে অন্নপূর্ণা-অন্ত্যোদয়, বিপিএল বা সেলফ্ হেল্প গ্রুপ তৈরী করার দাবীর মতো শাসকশ্রেণীর তৈরী করা গণ্ডীর মধ্যে ঘোরাফেরা করে তারই উদ্যোগ গ্রহণ করো। এমনকি কৃষিজীবী বা অরণ্যবাসী মানুষকে তার জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার দিয়ে, তার মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার দিয়ে, জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মৌলিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে ভূমিপুত্রদের বিকাশের কোনো পথ শাসকশ্রেণী গ্রহণ করবে না। সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত শাসকশ্রেণীর যে সমস্ত প্রকল্পগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যেই তারা মানুষকে আটকে রাখতে চাইবে। লালগড় আন্দোলনকে ঠেকানোর সেই পথই নিয়েছে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যদি প্রশাসনের এই ভ্রান্ত পথ সম্পর্কে মোহমুক্ত না হন তাহলে কিন্তু আন্দোলন চোরাগলিতে ঢুকে পড়বে। আশা করা যায় জনসাধারণের কমিটি-র নবীন নেতৃত্ব এই প্রতারণাকে চিহ্নিত করবেন এবং আগামীদিনে নতুন দাবীসনদ নিয়ে, বৃহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন উদ্যমে আন্দোলন পরিচালনা করবেন।

নতুন পর্যায়ে আন্দোলন

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

গ্রামের ৩জন স্কুলছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে গ্রামের মানুষ ডেপুটেশন দেয়। পুলিশ কর্ণপাত করে না। ৪ঠা নভেম্বর দীপক প্রতিহারকে গ্রেফতার করতে গেলে তাঁর স্ত্রী লক্ষী প্রতিহার প্রতিবাদ করেন। লক্ষী একজন শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের কর্মী। তিনি ছিলেন গর্ভবতী। পুলিশ তার ওপর অত্যাচার করে। এরপর কাঁটাপাহাড়ি স্কুলের একজন সম্মানীয় শিক্ষককে পুলিশ নির্যাতন করে। ছোট পেলিয়া গ্রামে ঢুকে পুলিশ মহিলাদের উপর অত্যাচার চালায়। ছিতামনি মুর্মুর চোখ পুলিশ নষ্ট করে দেয়। বহু মহিলাকে মারধর করে।

পরপর এইসব পুলিশী অত্যাচারের ঘটনায় মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুরু হয় গাছ কেটে অবরোধ। আন্দোলনকারীদের আশা ছিল প্রশাসন এসে তাদের সাথে আলোচনায় বসবে। কিন্তু প্রশাসন আন্দোলনকারীদের পাত্তা দেয় না। এরপর অবরোধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গাছ কেটে, রাস্তা কেটে অবরোধ শুরু হয় প্রতিদিন নতুন নতুন জায়গায়। লালগড় অবরুদ্ধ হয়। ক্রমান্তরে ঝাড়গ্রাম শহর অবরুদ্ধ হয়। ধীরে ধীরে গোটা ঝাড়গ্রাম মহকুমা অচল হয়ে যায়। প্রতিটি অবরোধে মহিলাদের অংশগ্রহন ছিল লক্ষণীয়। তীর-ধনুক, টাঙ্গি, বল্লম, কুঠার, লাঠি প্রভৃতি সাবেকি অস্ত্র নিয়ে মানুষ অবরোধ আন্দোলনে সামিল হয়। যদিও আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ কিন্তু আপামর আদিবাসী জনতার ক্ষোভ দেখে সি.পি.এম. নেতৃত্বতো বটেই এমনকি প্রশাসনও ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। দীর্ঘ ১মাস ৬দিন এই অবরোধ চলা সত্ত্বেও সি.পি.এম. এর দোদর্ন্ডপ্রতাপ নেতাদের মুখে কোনো আওয়াজ ছিল না। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের আদিবাসী মোড়লদের সংগঠন 'ভারত জাকাত মাঝি মাড়োয়া' এই আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও 'জোয়ান জুমিত গাঁওতা', 'এ্যাসেকা' ইত্যাদি সামাজিক সংগঠনগুলি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে থাকে। দলমত নির্বিশেষে আদিবাসী সমাজ এই আন্দোলনে অংশগ্রহন করে।

সামনাসামনি না পেরে পেছন থেকে আন্দোলন ভাঙার খেলা শুরু হয়। ঝাড়খন্ডের কোন কোন গ্রুপ এই আন্দোলনকে প্রত্যাহার করানোর জন্য উদ্যোগ চালায়। কিন্তু জনসমর্থন হারানোর ভয়ে সামনে আসতে সাহস করেনি। ঝাড়গ্রামের অবরোধ তুলতে সক্রিয় ভুমিকা নেয় শিল্পপতি পাটোয়ারীও। ভারত জাকাত মাঝি মাড়োয়ার নেতা নিত্যানন্দ হেমব্রমও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কোনোরকম পরামর্শ না করে একতরফা আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা ঘোষনা করেন। এরপর আন্দোলনের সামনে আসে 'পুলিশী অত্যাচার বিরোধী জনসাধারণের কমিটি'। বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিটি তৈরী হয়। ৩৫জনের একটি কোর কমিটি গঠন করা হয়। তারাই আন্দোলনের প্রধান সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে। এই কোর কমিটিতে রয়েছেন ১২জন মহিলা।

কমিটির সম্পাদক সিধু সোরেন, সভাপতি লালমোহন টুডু এবং প্রধান মুখপাত্র ছত্রধর মাহাতো। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত এই জনসাধারণের কমিটির নেতৃত্ব কিন্তু আদিবাসী সমাজ মেনে নেয়।

মাওবাদীরা এই আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ একথা মানতে নারাজ। যেমন ছত্রধর মাহাতো বললেন, 'মাওবাদীরা তো খুনখারাপী করে। কিন্তু এই দীর্ঘ একমাসের আন্দোলনে কোনো মারধরের কথাও শুনেছেন কি?' আন্দোলনের সাধারণ সমর্থকদের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই। কেউ মাওবাদী সংগঠন করতেই পারে। আদিবাসী সমাজে যে কেউ যে কোনো দল করতে পারে। সেটা বড় কথা নয়। আসলে এটা হল গোটা আদিবাসী সমাজের লড়াই। দীর্ঘদিনের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে আদিবাসী ডাক্তার, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সকলের এক কথা - 'যখনই আমরা আমাদের সমস্যাগুলোর কথা বলি তখনই আমাদের গায়ে একটা ছাপ্পা মেরে দেওয়া হয়, কখনও বিছিন্নতাবাদী, কখনও মাওবাদী।'

বহু সি.পি.এম. সমর্থক আদিবাসী মানুষও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের বক্তব্য, 'এটা আমাদের সমাজের আন্দোলন।' এই আন্দোলোনের দাবীগুলিও ভিন্ন ধরনের। যে পুলিশ অফিসার মহিলাদের গায়ে হাত দিয়ে অন্যায় করেছে, সে কান ধরে উঠবোস করবেনা কেন? - এই দাবী আদিবাসী মহিলাদের একটি স্বতঃস্ফুর্ত দাবী।

আপামর মানুষের সমর্থন থাকার জন্যই দীর্ঘ ১মাসের ওপর এই আন্দোলন টিকে থাকতে পেরেছে। কলাবণিতে পুলিশ চারজন অবরোধকারীকে গ্রেফতার করেও জনরোষের চাপে বাধ্য হয়েছে তাদেরকে আন্দোলনের জায়গায় ফিরিয়ে দিতে। প্রায় চার-পাঁচ হাজার সশস্ত্র আদিবাসী মানুষ পুলিশ অফিসারদের চার-পাঁচ ঘন্টা ঘেরাও করে রেখে তাদের আন্দোলন কর্মীদের ছাড়িয়ে এনেছেন। বিপুল জনসমর্থন না থাকলে এটা করা সম্ভব নয়।

শেষদিকে সি.পি.এম. কিছু পেটোয়া আদিবাসী লোককে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে অবরোধ ভাঙতে গেছে। আসলে তার আগেই কমিটি অবরোধ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। হয়ত এই নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্যও হয়েছ। সেটা স্বাভাবিকও। কারণ দীর্ঘ অবরোধে অসুবিধা হচ্ছিল সাধারণ মানুষেরও। সেটা আন্দোলনকারীরাও অনুভব করছিলেন।

তাই অবরোধ উঠলেও আন্দোলন ভেঙে যায়নি। চলছে গ্রামে গ্রামে মিটিং। নতুন নতুন গ্রাম এই আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে জনশুনানি হচ্ছে। সমস্যা সমাধানের নামে তাদের যে ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে, এটা স্পষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের কাছে।

একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে 'জনসাধারণের কমিটি'-র মুখপাত্র ছত্রধর মাহাতো জানিয়েছিলেন, 'জনসাধারণের ঐক্যটাই আমাদের বড় জয়। এই জয়ের উপর দাঁড়িয়েই আমরা আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। আগামী জানুয়ারী মাসেই শুরু হবে নতুন পর্যায়ের আন্দোলন। তার প্রস্তুতির কাজ চলছে।'

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ওবামার জয়

শংকর দাস

খচখচানি ১।

আইন করে ক্রীতদাসপ্রথা রদ করার পর একশ বছর লেগেছিল ভোট দানের অধিকার করতে। আর তারও প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর আমেরিকার ঐতিহাসিক ৪৪তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আমেরিকা পেল তাদের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাকে। যদিও একজন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেই কৃষ্ণাঙ্গদের সামাজিক বৈষম্য খতম হয়ে যাবে এমনটা মনে করার লোক একেবারেই হাতে গোনা, তথাপি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনার এক প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। ঠিক যেমন ভিন্নতর আরেকটি প্রতীকী তাৎপর্য তৈরী হল যখন নির্বাচনী সংঘর্ষে সবার অলক্ষ্যে বারাক হুসেন ওবামা হয়ে উঠলেন বারাক ওবামা। 'মুসলমানরা সব সভ্যতার শত্রু' — ধর্মবিদ্বেষী এই প্রচারে যখন বৈধতা পাচ্ছে আগ্রাসী আমেরিকার যুদ্ধজিগির তখন ওবামা তার নামের মধ্য পদটি এইভাবে লোপ করলেন কেন? নাম বিভ্রাটে তাকে যাতে কেউ মুসলমান বলে ভাবতে না পারেন সেই জন্য? এই মধ্যপদলোপী কর্মধারা সঞ্জাত কুৎসিত আপোষটি দিয়ে তিনি কোন স্বপ্নের জন্মদাতা হবেন?

খচখচানি ২।

একদিকে আর্থিক বেহাল অবস্থা অন্যদিকে ইরাক যুদ্ধের মারাত্মক ক্ষতির ব্যয়ভার যখন প্রেসিডেন্ট বুশের জনপ্রিয়তা তলানিতে নিয়ে গেছে তখন সরকার পরিবর্তনের আকাঙ্খা আম-আমেরিকান-দের মনে স্বাভাবিক চাহিদা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ওবামাও নির্বাচনের স্লোগান তুলেছিলেন—হ্যাঁ, পাল্টাতে আমরাই পারি। কিন্তু পরিবর্তন শব্দটাতে জোর দিয়ে তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল (৭৮ কোটি ডলার) যে প্রচার চালালেন তাতে কোথাওই পরিবর্তনটি তিনি ঠিক কি করবেন তা স্পষ্ট করে বললেন না। 'ব্র্যান্ড ওবামা'য় গদগদ বাচাল বুদ্ধিজীবীরা বললেন যে এই অস্পষ্টতাই নাকি ওবামার অ্যাডভান্টেজ। অবশ্য তা হতেই পারে। প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাকেনকে প্রায় উড়িয়ে দিয়ে ওবামা জিতে এসেছেন। কিন্তু প্রচারে পরিবর্তন নিয়ে এই অস্পষ্টতার কারণ কি? ওবামার মনে কি ভয় ছিল যে বেশী কথা বলতে গেলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে বরাবরের মত এবারেও রিপাব্লিকানদের সাথে ডেমোক্র্যাটদের মূল নীতি বিষয়ক খুব কিছু পার্থক্য নেই? তার থেকে বাবা শুধুপরিবর্তন পরিবর্তন বলে যাও আর ধোঁয়াশা রেখে যাও। এইভাবেই কি নেগেটিভ ভোট টার্গেট করলেন ওবামা? এবং চতুর শাসকশ্রেণী সাধারণ মানুষকে যেভাবে যুগ যুগ ধরে প্রতারিত করে এসেছে তার আরও একবার সফল প্রয়োগ ঘটালেন?

খচখচানি ৩।

বলবো না বলবো না করে তবু কিছু কথা বলেছেন ওবামা। আর্থিক মন্দায় বিধ্বস্ত আমেরিকাবাসীর কাছে ওবামা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি নির্বাচনে জিতলে আউটসোর্সিং বন্ধ করে দেবেন। আমেরিকার বিভিন্ন কোম্পানীগুলি তাদের অনেক কাজ তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রমিক নিয়োগ করে করিয়ে থাকে। এই ঘটনাকে বলা হয় আউটসোর্সিং। ওবামা আরও বলেছেন যে তিনি জিতলে নাকি অভিবাসন নীতির বদল ঘটাবেন। অর্থাৎ বিশ্বের যেখান সেখান থেকে সস্তা শ্রমিকের দল আমেরিকায় এসে চাকরি করবে আর সে দেশের আমজনতা আঙুল চুষবে—এটা আর হবে না। অথচ ওবামার প্রচারে অনাবাসী ভারতীয়রা, ওবামার নীতি কার্যকরী হলে যাদের সবার আগে চাকরী যাওয়ার কথা, তারা দলে দলে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রচুর চাঁদা তুলেছেন। যে কোম্পানী সবথেকে বেশী আউটসোর্সিং করে সেই মাইক্রোসফটের চেয়ারম্যান বিল গেটস নিশ্চিন্ত মনে বলেছেন— ওবামা ঠিকই শিল্পের চাহিদা বুঝবেন। ওবামার প্রচার তহবিলে শোনা যাচ্ছে তিনিও প্রচুর টাকা দিয়েছেন। ব্যাপারটা তো ঠিক মিলছে না। অন্যদিকে নোয়াম চমস্কির লেখা থেকে জানা যাচ্ছে যে, আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমেরিকাতে বর্তমানে বেকার সংখ্যা জনসংখ্যার তিরিশ শতাংশ। তাহলে কি এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি জনসংখ্যার ঐ তিরিশ শতাংশ ভোটকে নানা ছলচাতুরী সহযোগে নিজের ভোটবাক্সে নিয়ে আসার কৌশলমাত্র? অবশ্য হতেই পারে। কারণ ওবামা জিতেছেন বেশ ভালোই ব্যবধানে। আর ঐ তিরিশ শতাংশের ভোট ছাড়া সেটা হতে পারতো না। কিন্তু তাহলে তো এত কাঠখড় পুড়িয়েও বুশকে হোয়াইট হাউস থেকে

ইন্টারনেটে প্রকাশিত একটি পোস্টার

তাড়ানো গেল না। বুশ রয়েই গেল, বড়জোর বলা যেতে পারে যে ইদানীং বুশকে দেখতে ওবামার মত হয়েছে!

খচখচানি ৪।

জর্জ বুশের ইরাক নীতি নিয়ে আমেরিকার আমজনতা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। ইরাকের ওপর দখলদারি বজায় রাখতে গিয়ে প্রতিদিন যে পরিমান ডলার এবং মানবসম্পদ খোয়াচ্ছে আমেরিকা তাতে বেহাল অর্থনীতির ফাঁসে হাঁসফাঁস করতে থাকা সাধারণ মানুষের রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করে সরকারের এই বিশাল পরিমাণ ক্ষতির বিনিময়ে যখন সেখানে ব্যাপক মুনাফা কামাচ্ছে আমেরিকান কর্পোরেট কোম্পানীগুলি। সরকারের ক্ষতি হলে সেই ব্যয়ভারটা সরাসরি পড়ে জনগনের কাঁধে। যুদ্ধের অজুহাতে সরকার অনেক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলে দিচ্ছে। অন্যদিকে ফুলে ফেঁপে উঠছে পুঁজিপতিরা। মানুষের ক্ষোভকে পুঁজি করে নির্বাচনে জিততে গিয়ে ওবামা বুশের ইরাক নীতির তীব্র সমালোচনা করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে জিতলে তিনি আঠারো মাসের মধ্যে ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবেন। কিন্তু 'অশ্বত্থামা হত'র সাথে থাকে 'ইতি গজ'। যতটা সোচ্চারে ওবামা এই কথাগুলো বললেন ততোধিক আস্তে আরো কিছু কথা তিনি যোগ করলেন। বললেন কাশ্মীর সমস্যা এবার আমেরিকা তার নিজের হাতে তুলে নিতে চায় এবং আফগানিস্তানের সরকার যদি আল কায়দাকে দমন করতে না পারে তাহলে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মাটিতে আমেরিকা খোদ এই দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ যুদ্ধের স্থান বদলে যাবে। ভারতীয় উপমহাদেশে আরও সক্রিয় মার্কিন বাহিনী, আরও সক্রিয় মার্কিন উপস্থিতি— এই কি তাহলে ওবামার বৈদেশিক নীতি? ইরাকের ধ্বংসস্তুপে এখন লীলা খেলছে আমেরিকান কোম্পানীগুলি। আগামীদিনে ভারতীয় উপমহাদেশে যাতে সেই সুযোগ আমেরিকান কর্পোরেটগুলি পায় এবং আজকের সাংঘাতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তারই সুযোগ তৈরী করাই কি ওবামার উদ্দেশ্য? অবশ্য হতেই পারে। ৭৪ কোটি ডলার তো ফেলনা নয়। সাধারণ মানুষের সাধ্যি কি তা জোটায়। পুঁজিপতিরা ওবামার পেছনে এই টাকা (কাগজে কলমে) বিনিয়োগ করলো কালকে এর দশগুণ টাকা লাভ করবে বলেই তো! কিন্তু এ তো বুশের নীতির লড়াই নয়, সে নীতিরই সফল সম্প্রসারণ!

উপরের খচখচানিগুলো সারা পৃথিবীর অসংখ্য কোটি মেহনতি মানুষের মনের কথা। আমরা স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে তা তুলে ধরলাম। আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাস ইতিমধ্যেই এই ঘটনা স্পষ্ট করে দেখিয়েছে যে জাতীয়-আন্তর্জাতিক মৌলিক নীতির প্রশ্নে ডেমোক্র্যাট পার্টি আর রিপাব্লিকান পার্টির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ঠিক যেমন আমাদের দেশের শাসক শ্রেণীর পার্টিগুলো কংগ্রেস, বিজেপি বা এমনকি সিপিএম— মৌলিক নীতির প্রশ্নে, পুঁজির শাসনের পক্ষে দাঁড়ানোর প্রশ্নে, বিশ্বায়নের চাহিদা মেটানোর প্রশ্নে সংশয়াতীতভাবেই একজোট। প্রচারের চোখ ধাঁধানো জৌলুস এই সামান্য সত্যটিকে সাধারন মানুষের মন থেকে অনেক সময়ই ভুলিয়ে দেয়। পাশাপাশি কার্যকরী বিকল্পের অভাবও সত্যিকারের পরিবর্তনের পথে একটা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ওবামাকে নিয়ে আজকের সমস্ত প্রত্যাশার ফানুস আগামী দিনেই ফেটে যাবে। পুঁজির শাসনের অধীনে এক কৃষ্ণাঙ্গ, কিম্বা এক গরীব মানুষ এমনকি প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিতলেও সাধারন গরীব জনতা অথবা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের অবস্থার কোন ইতরবিশেষ পরিবর্তন হয় না—এ জিনিস অতীতে বারবার প্রমাণ হয়েছে, আজও হবে।

তবে আমরা তাকিয়ে আছি প্লাম্বার জো-র দিকে। ওবামার প্রচার যখন মধ্য গগনে তখন জোসেফ ভুর্ৎজেলবাখার নামে একজন কলের মিস্ত্রী ওবামাকে করকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। ওবামা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নতুন কাঠামোয় সবারই মঙ্গল হবে। প্রতিশ্রুতির ফানুস ফেটে গেলে পরে থাকে তিক্ত বাস্তব। আর সেই বাস্তবের মাটিতেই ভুর্ৎজেলবাখাররা শাসকশ্রেণীর পার্টিগুলিকে ত্যাগ করে সারা দুনিয়াজুড়ে নিজেদের শ্রেণিকে গুছিয়ে তুলবে। নিজেদের হাতে তুলে নেবে ক্ষমতা। তখন মুমতাজের আল জায়দির ছুঁড়ে মারা জুতোর মাপ নিয়ে জেলে বসে বুশ আর ওবামা আলোচনা চালাতেই পারেন। ভুর্ৎজেল-বাখাররা কিন্তু গড়ে তুলবেন নতুন আমেরিকা— নতুন বিশ্ব। আর সেটাই হবে সত্যিকারের পরিবর্তন।

কর্পোরেট দুর্নীতি, কর্পোরেট বুদবুদ

সত্যমের সত্য উন্মোচিত

কৌস্তভ দে

অবশেষে ভারতের আই.টি. সেক্টরে বিশ্বপুঁজির কালো ছায়া নেমে এল। এ বছর জানুয়ারী মাসে সত্যম কম্পিউটার সার্ভিসেসের তছরূপের ঘটনাটি জনসমক্ষে এসে পড়ে। এই সত্যমই গত এক দশক ধরে এক অন্যতম শীর্ষ আই.টি. সংস্থা হিসেবে কাজ করে চলেছে। সত্যম এবং তার প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান চেয়ারম্যান রামালিঙ্গম সেজন্য পুরস্কৃত হয়েছেন বহুবার। ১৯৯৯ এবং ২০০৭ সালে তিনি Ernst & Young Entrepreneur of the Year Services হয়েছিলেন; ২০০০ সালে Dataquest IT Man of the Year Award পেয়েছিলেন; ২০০২ সালে The Asia Business Leader Award পেয়েছিলেন; ২০০৬ সালে তিনি ন্যাসকম্ এর চেয়ারম্যান হন। এই সংস্থাটি ভারত সরকারের ন্যাশানাল ইনফরমেশন পলিসি তৈরীতে সহায়তা করে। তাঁর তত্ত্বাবধানে সত্যম গোল্ডেন পিকক্ অ্যাওয়ার্ড পায়। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, ন্যাশানাল স্টক এক্সচেঞ্জ, নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ, ইউরোনেক্সট স্টক এক্সচেঞ্জ এ কোম্পানিটির নাম নথিভুক্ত ছিল। সারা ভারতে এদের কর্মী সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০। গত ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে ১.৬ বিলিয়ন ডলার দিয়ে 'মায়টাস' কোম্পানি অধিগ্রহন করার অযৌক্তিক প্রস্তাব জানান রামালিঙ্গম। অন্যান্য বিনিয়োগকারীরা তাতে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখায়, ফলতঃ প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হয় না। এর তিন সপ্তাহ বাদে রামালিঙ্গম জানান ৭,০০০ হাজার কোটি টাকা কারচুপির ঘটনাটি নাকি ঐ অধিগ্রহনটির দ্বারা মেটানো যেত। ফলে তার পরেই ১০ই জানুয়ারী ২০০৯, শেয়ারের দাম ১১.৫ টাকায় পড়ে যায়। ১৯৯৮ সালের পর এটাই সর্বনিম্ন। গত বছর শেয়ারের সর্ব্বোচ্চ দাম ছিল ৫৪৪ টাকা। অন্যান্য সংস্থা বিশেষত আই.টি. এই ব্যাপারে কি প্রতিক্রিয়া জানাবে বুঝতে না পেরে তারা তড়িঘড়ি নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহন করে এবং ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাবী করে সত্যম ভারতের একটি ব্যতিক্রমী আ.টি. সংস্থা। সত্যমের অডিটের দায়িত্বে ছিল প্রাইস ওয়াটার-হাউস কুপারস (পি.ডব্লিউ.সি.) -এর হাতে। বছরের পর বছর তারা সত্যমের এই অনিয়ম মেনে নেয় এবং কোম্পানিটিকে ক্লিনচিট দিতে থাকে। এইরকম অনিয়মকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে পি.ডব্লিউ.সি.-র দুর্নাম আছে, যদিও এটি ভারতের বৃহত্তম অ্যাকাউন্টেন্সি ও প্রফেশনাল সার্ভিসেস ফার্ম। এই কারচুপি ধরা পড়ার আগে সত্যমের কর্মীরা প্রাথমিকভাবে কিছুই ধরতে পারেনি। ছাঁটাইয়ের ভয়ে এবং এই পরিস্থিতিতে অন্য কোথাও কাজ পাওয়া সুবিধাজনক নয়, সেজন্য দুমাসের বেতন না পাওয়ার ম্যানেজমেন্টের সাথে চুক্তি মেনে নেয়। অন্য আই.টি. কোম্পানিগুলি এই অবস্থায় সত্যমের কর্মীদের অতি কম বেতনে কাজ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় লগ্নিপুঁজির অবস্থা শোচনীয়। এই কোম্পানীগুলোর শেয়ারের দাম কোনোদিন আকাশচুম্বি তো পরেরদিন ধরাশায়ী। সত্যমের চূড়ায় বসে রাজু এই সুযোগের ব্যবহার করে অন্যদের সাথে প্রবঞ্চনা করে। অথচ প্রতিবছর সেরা পুরস্কারগুলো রাজু এবং তার কোম্পানী সত্যম পেয়েছে, যদিও তার নাটকীয় স্বস্তিকর অবস্থাটা ছিল সম্পূর্ণ লোকদেখানো। বিসনেস হাউস, মিডিয়া, সরকার এবং সেই সমস্ত কোম্পানী যারা সত্যম দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে লাভবান, তারাই রাজুর এই অসদুদ্দেশ্যের প্রতি সবচেয়ে বেশী সরব হয়েছে।

সত্যমের এই ঘটনা একদিকে ব্যাপকভাবে সামনে এনেছে গোটা আইটি শিল্পের বুদবুদের চেহারাটাকে, অন্যদিকে দেখালো কর্পোরেট দৈত্যরা কিভাবে নিজেদের বোঝাপড়া বজায় রেখে চালায় সীমাহীন দুর্নীতি।

পুরনো থেকে নতুন বছরে

বাড়ছে অনিশ্চয়তা

২০০৮-এ রেকর্ড ছাঁটাই আমেরিকায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে হিসেব করলে গত বছরই সবচেয়ে বেশী মানুষ কাজ হারিয়েছেন খোদ মার্কিন মুলুকে। ১১ই জানুয়ারী প্রকাশিত বিবিসির এক খবরে এমনই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। ২০০৮ জুড়ে কাজ হারিয়েছেন ২৬ লক্ষ মানুষ, অর্থাৎ ঐ পদগুলো অবলুপ্ত করা হয়েছে। শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসে কাজ হারিয়েছেন ৫ লক্ষ ২৪ হাজার মানুষ। আমেরিকাতে বেকারের সংখ্যা পৌঁছেছে ৭.২ শতাংশে, যা গত ১৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। অক্টোবর মাস থেকে প্রতি মাসে কর্মচ্যুতি যত হবে বলে হিসেব করা হয়েছিল বাস্তবে তার চেয়ে কর্মচ্যুতি প্রতি মাসেই তার চেয়ে বেশী হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের কর্মচ্যুতির মধ্যে পরিষেবামূলক ক্ষেত্রে ২,৭৩,০০০ আর উৎপাদনক্ষেত্রে ১,৪৯,০০০, নির্মাণক্ষেত্রে ১,০১,০০০, খুচরো ব্যবসায় ৬৭,০০০। কাজ যারা হারাননি, তাদের কাজের সময় কমেছে। সাপ্তাহিক কাজের সময় ৩৩.৩ ঘন্টা থেকে ০.২ ঘন্টা কমেছে, যা ১৯৬৪-র পর সবচেয়ে কম। পার্টটাইম কাজ করেন এমন কর্মীর সংখ্যা গত বারো মাসে ৩৪ লক্ষ থেকে বেড়ে ৮০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে।

২০০৯-এ ব্যাপক কর্মচ্যুতির আশংকা

নতুন বছর কি সুদিন আনবে? না, বিভিন্ন দেশের নানা সংস্থার রিপোর্ট বলছে যে ২০০৯ সালও হবে এক ব্যাপক কর্মচ্যুতির বছর। ইংল্যান্ডের সিআইপিডি নামক সংস্থা জানাচ্ছে ২০০৯-এ ইংল্যান্ডে ৬ লক্ষ মানুষ কাজ হারাবেন, যদি বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয় তবুও। ভারতের এক্সপোর্ট সেক্টরে কর্মরত ১৫ কোটি মানুষের ১কোটি জন কাজ হারাবেন। মাইক্রোসফটের মত কোম্পানীও এই প্রথম কর্মচ্যুতির আক্রমণ নামাবে বলে শোনা যাচ্ছে।

মতামত ও লেখা পাঠানো সহ সমস্ত ধরণের যোগাযোগ:
সম্পাদক
শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র
শ্রমিকশক্তি
৩৬/২ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯
ফোন : ৯৪৩৩২৪২৪৯৮
(বৃহস্পতিবার, ২-৫ টা)
shramikshakti@gmail.com

অন্ডালে বিমানবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণ

বিশেষ প্রতিবেদন: জমি অধিগ্রহণকে ঘিরে বিতর্ক এবার অন্ডালে। গত ১১ই ডিসেম্বর সরকারী এক নোটিশে জানানো হয় যে বেঙ্গল অ্যারোট্রোপোলিস প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে এখানে বিমানবন্দর গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১০,০০০ কোটি টাকার এই প্রজেক্টের জন্য প্রয়োজন ৩৫০০ একর জমি। প্রথম দফায় নেওয়া হবে ২৩৬৪ একর।

কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গে জমি অধিগ্রহণ এক অন্য পর্বের সূচনা ঘটিয়েছে। এখানকার জমি অনেকাংশ এক ফসলী বা অনুর্বর। তবু ঐ জমি যাদের বাপ-দাদার তারা ঐ জমি অধিগ্রহনের ফলে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে না পেলে তাদের শেষ সহায় সম্বল জমি ছাড়বে কেন? ১২ টি মৌজার কৃষকরা একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছেন তাদের কমিটি। দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক সমস্ত জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষকদের কোনো লাভ হচ্ছে না, লাভ হবে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের। এখানেও সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের ২৬ শতাংশ ভাগীদারির কথা হয়েছে, যদিও চূড়ান্ত সইসাবুদ এখনও হয়নি।

বেঙ্গল অ্যারোট্রোপোলিস প্রজেক্টস লিমিটেড এখানকার কৃষকদের জন্য সাড়ে সাত থেকে সওয়া এগারো লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করলেও কৃষকদের দাবী তাদের বিকল্প জমি দিটে হবে। এবং সেই বিকল্প জমির পরিমাণ হতে হবে তাদের প্রদত্ত জমির অর্ধেক। এবং ঐ জমি হতে হবে বিকাশাধীন এলাকায়। তারা জানিয়েছেন যে, এখন তাদের বলা হয়েছে যে তাদের প্রতি বিঘা জমির জন্য এক কাঠা জমি দেওয়া হবে। তাছাড়া কিছু ট্রেনিং ও পুনর্বাসনের কথাও বলা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাতে সম্মতি দিলেও অনেকেই কিন্তু সেই প্রস্তাব মানতে নারাজ। তাদের দিতে হবে অধিগৃহীত জমির অর্ধেক পরিমাণ। তারা জমির বদলে জমি ও প্রকল্পে কাজের দাবী রেখেছেন, কথা বলতে চেয়েছেন সরাসরি ঐ কোম্পানীর সাথে।

পাশাপাশি, কোল ইন্ডিয়াও আপত্তি জানিয়েছে এই প্রকল্পের ব্যাপারে। তাদের বক্তব্য এই প্রকল্প এখানে হলে খনির কাজ করা যাবে না, ফলে এই প্রকল্প না করার সুপারিশও জানিয়েছে তারা। রাজ্য সরকার অবশ্য তড়িঘড়ি অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রককে এই ব্যাপারে কোনো সমস্যা হবে না, এই আশংকা অমূলক জানিয়ে চিঠি দিয়েছে।

১১ই জানুয়ারী পর্যন্ত ৮ টি মৌজার ৯২৯ জন জমির মালিক বর্ধমানে জেলাশাসকের দপ্তরে তাদের আপত্তির কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। যদিও জেলাশাসক মনীশ জৈন জানিয়েছেন যে 'ওসব কাগজপত্র তিনি পাননি।'

ওখানকার মানুষের বক্তব্য যে সরকার তো রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কথা বলে জমির দর ঠিক করেছে, তাদের সাথে কথা বলেনি। তাদের জমির দর কি করে সরকার ঠিক করে? প্রজেক্টের প্রমোটারের উচিত সরাসরি জমির মালিকদের সাথে কথা বলা।

বকেয়ার দাবীতে রাস্তায় টিটাগড় লুমটেক্সের শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রায় প্রতি বছর চটশিল্পে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা ধর্মঘট চটশিল্পের শ্রমিকদের নিষ্ক্রিয় করে তাদের ন্যায্য দাবীদাওয়াগুলিকে ঠান্ডা ঘরে ঠেলে দেয়। মালিকপক্ষকে সুযোগ করে দেয় আরো সংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনার। কিন্তু ১লা ডিসেম্বর-১৮ই ডিসেম্বর, ২০০৮ অবধি চটশিল্পে কেন্দ্রীয় ইউনিয়নগুলির (সিপিএম প্রভাবিত বিসিএমইউ বাদে) ডাকা ধর্মঘট সাক্ষী হয়ে রইলো সেই জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনের যাকে খতম করতেই ধর্মঘটের সাড়ম্বর আয়োজন।

গত ৮ই ডিসেম্বর খড়দহ-টিটাগড় এলাকার লুমটেক্স ইঞ্জিনীয়ারিং প্রাঃ লিঃ জুটমিলের সহস্রাধিক শ্রমিক বিটি রোড অবরোধ করতে নেমে পড়েন। ধর্মঘটের জন্য মিল বন্ধ হওয়ার আগে শ্রমিকরা যে কাজ করেছিলেন তা বাবদ মজুরি বকেয়া ছিল। ৯ই ডিসেম্বর ছিল বকর-ঈদ। তার আগেই, অর্থাৎ ৫,৬,৭ তারিখে লুমটেক্সের আশেপাশের মিলগুলিতে বকেয়া মজুরী মিটিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু লুমটেক্সে ম্যানেজমেন্ট ও প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের নানারকম আশ্বাস ছাড়া শ্রমিকদের আর কিছুই জোটে না। ৮ই ডিসেম্বর শ্রমিকরা যখন দেখেন কর্তৃপক্ষ মিল ছেড়ে পালিয়েছে তখন তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির নেতাদের ধরেন। প্রথমে তারা নেতাদের খড়দহ থানায় নিয়ে যান ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে। কিন্তু থানা অসহযোগিতা করলে শ্রমিকরা মিল গেটে ফিরে এসে বিটি রোড অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। স্থির হয়, নেতাদের সামনে রেখে শ্রমিকরা অবরোধে নামবেন, যাতে করে পুলিশ-প্রশাসন এলে সর্বাগ্রে লাঠি খেতে হয় ঐ নেতাদেরই। শ্রমিকদের দৃঢ়

যে ইউনিয়নগুলি ধর্মঘট ডেকেছিলো, ধর্মঘট চলাকালীনই শ্রমিকদের বিসিএমইউ সহ সেসব ইউনিয়ন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ও তাদের ডাকা ধর্মঘটের থেকে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতাকেই আবারো চিহ্নিত করলো।

বিশ্বাস ছিল যে নেতা-কর্তৃপক্ষ যোগসাজশেই তাঁদের মজুরী আটকে আছে। তাই তাঁরা কর্তৃপক্ষকে না পেয়ে নেতাদের কাঠগড়ায় তোলেন।

শ'য়ে শ'য়ে শ্রমিক অবরোধে এসে সামিল হন এবং ক্রমে অবরোধ ব্যাপক আকার ধারন করে। শ্রমিকদের মেজাজ দেখে দালাল নেতারা ক্রমশ পিছু হটতে থাকে এবং যখন পুলিশ এসে হাজির হয়, তারা রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে আশ্রয় নেয়। পুলিশের আচমকা আগমনে শ্রমিকরা কিছুটা উদভ্রান্ত হয়ে গেলেও অবরোধ তোলেন না। অবশেষে তিন ঘন্টা অবরোধ চলার পর যখন পরিষ্কার হয় যে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তখন শ্রমিকরা লুমটেক্সের একমাত্র লড়াকু ইউনিয়ন, সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নকে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ জানায়। সংগামী মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব প্রায় এক ঘন্টা ধরে পুলিশের সাথে কথাবার্তা চালায়। পুলিশ জানায় পলাতক ম্যানেজমেন্টকে খুঁজে বের করে মজুরীর ব্যাপারটা ফয়সালা করতে তাদের ঘন্টা চারেক সময় লাগবে। শ্রমিকরা লিখিত প্রতিশ্রুতি চায়। কিন্তু পুলিশ তা দিতে অস্বীকার করে এবং হঠাৎই, কোনো আগাম হুঁশিয়ারি ছাড়াই, বেলঘরিয়া সাবডিভিশনের কুখ্যাত এসডিপিও অশোক রায় লাঠিচার্জের নির্দেশ দেয়। শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষের ফাঁকে দালাল নেতারা পালিয়ে যায়। অবশেষে লাঠির ডগায় অবরোধ উঠলেও এলাকার শ্রমিকরা ফুঁসতে থাকেন পুলিশ-ম্যানেজমেন্ট-দালাল নেতাদের অশুভ জোটের বিরুদ্ধে। ভাবগতিক দেখে ম্যানেজমেন্ট বাধ্য হয় দু'দিন বাদে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লুমটেক্সের শ্রমিকদের অবরোধ আন্দোলনের একদিন পরেই গৌরীশঙ্কর জুটমিলের শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বকে প্রত্যাখান করে রাস্তা ও রেল অবরোধ করেন বকেয়া মজুরীর দাবীতে। লুমটেক্সের আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁরা আরো সুশৃঙ্খল অবরোধ আন্দোলন করে পুলিশকে বাধ্য করেন মজুরী না দেওয়ার অপরাধে মিলের পার্সোনাল ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করতে।

সংকট কবলিত বিশ্ব পুঁজিবাদ

৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কনেথ রজফের দেওয়া একটি হিসাব অনুযায়ী, মার্কিন ফিনান্স সেক্টর কর্পোরেট মুনাফার ৩০% এবং মজুরির ১০% পর্যন্ত আত্মসাৎ করে থাকে। (বিজনেস ওয়ার্লড : ১৩/১০/২০০৮)

রাষ্ট্রীয় লাগাম পরিয়ে ফিনান্স পুঁজির এই পরগাছাবৃত্তি কি বন্ধ করা যাবে? পুঁজিবাদে যেহেতু এখন ফিনান্স পুঁজিরই আধিপত্য, পুঁজিবাদকে তার খিদে তো মেটাতেই হবে। সুতরাং তার পরগাছাবৃত্তি থাকবেই। থাকবে ফাটকাবাজিও। আর এই ফাটকাবাজিই বার বার পুঁজিবাদের সংকটদীর্ণ চেহারাটাকে নগ্ন করে তুল ধরবে। যেমনটা দেখা গেল এবার, 'পুঁজিবাদের স্বর্গরাজ্য'। এ জিনিস চিরতরে কোনও দিনই বন্ধ হবে না। যতোই বলা হোক আজকের এই সংকট আসলে 'মেড ইন আমেরিকা', ে-রাগটা কেবল মার্কিন অর্থনীতির নয়। গোটা বিশ্ব পুঁজিবাদই আজ এই রোগে আক্রান্ত। এবং এটা পুঁজিবাদের এক দুরারোগ্য ব্যাধি। সুতরাং ভারতে নিযুক্ত ফ্রান্সর রাষ্ট্রদূত জেরাম বোনাফন্ট যখন লেখেন, ফিনান্স বাজারের বর্তমান ধস "পুঁজিবাদের দুরাচারেরও এক প্রকাশ, যেখানে অর্থ এবং ফিনান্স বাজার নিজেই নিজের লক্ষ্য হয় দাঁড়ায় এবং অর্থনৈতিক ও শিল্পীয় কার্যকলাপের উপায়স্বরূপ আর থাকে না"(টাইমস অফ ইন্ডিয়া : ১৫/১১/২০০৮), তখন তিনি অনিচ্ছাকৃত ভাবেই পুঁজিবাদের দুরারাগ্য ব্যাধির সত্যটাকেই আসলে স্বীকার করে বসেন। শ্রমিকশ্রেণীর দুর্ভাগ্য, পুঁজিবাদের এই দুর্দিনেও 'পুঁজিবাদ নিপাত যাক' শ্লোগানটুকু তোলার সামান্য জায়গাটুকুতেও তারা নেই।

চটশিল্পে ১৮ দিনের ধর্মঘট

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

নয়, কেন্দ্রীয় ইউনিয়নদের ডাকা সাজানো ধর্মঘট শেষ হল—শ্রমিকদের দাবি আদৌ যথার্থ কিনা তা খতিয়ে দেখার আশ্বাসের মধ্যে দিয়ে! তৈরী হল প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির শ্রমিকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার আরো একটা নজির।

প্রায় প্রতিটি জুটমিলে শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা নিয়ে নয়ছয়ের ঘটনা আজ আর কোনো গোপন ব্যাপার নয়। আদালতে মালিক-ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে চলছে অজস্র মামলা। বহু মামলায় ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও বেরিয়েছে। তৎসত্ত্বেও তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পুলিশ-প্রশাসনের প্রবল অনীহা। অবসরগ্রহণের ৪৫ দিনের মধ্যে গ্র্যাচুইটির টাকা মেটানোর আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের অবলীলায় অর্ধেক মজুরীতে খাটিয়ে চলেছে মালিকপক্ষ। ১৯৯৮ সালে জুটশিল্পে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল, তা মোতাবেক প্রতিটি মিলে ৯০ শতাংশ স্থায়ী শ্রমিক রাখতে মালিক দায়বদ্ধ। অথচ প্রতিটি মিলেই বছরের পর বছর ধরে শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ বন্ধ আছে। চলছে ভাগা-ভাউচার-কন্ট্র্যাক্ট প্রথার রমরমা। এবং এই অবস্থায়, যখন প্রতি পদে মালিক-ম্যানেজমেন্ট চুক্তিভঙ্গ করছে, আইনভঙ্গ করছে, তখন তার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের রাস্তায় নামানোর ন্যূনতম উদ্যোগ না নিয়ে, ১৮ দিন ধর্মঘট করার পর, প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলি আদায় করলো শ্রমিকরা আদৌ শোষিত হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার আশ্বাস! যে লড়াইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে শ্রমিকরা মালিক-ম্যানেজমেন্টকে প্রবল স্বস্তি এনে দিল এবারের ধর্মঘট অন্তের চুক্তি। যে অভিযোগে মালিকপক্ষ অভিযুক্ত — অনেকক্ষেত্রে শাস্তিপ্রাপ্ত— সেই অভিযোগের সারবত্তা নতুনভাবে খতিয়ে দেখার দায়িত্ব যদি যায় মালিকপক্ষেরই প্রতিনিধিরই হাতে, সঙ্গে দোসর দালাল ইউনিয়ন নেতৃত্ব, তাহলে যে অচিরেই মালিকপক্ষ স্বয়ং ভগবানের প্রতিভূ হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি পাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাই জুটশিল্পের লড়াকু শ্রমিকদের ওপর দায়িত্ব বর্তাচ্ছে এই কালা চুক্তির স্বরূপ প্রচারে নিয়ে গিয়ে শ্রমিকদের মালিকপক্ষ ও তার পৃষ্ঠপোষক সরকার-পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে নতুনভাবে সংগঠিত করার।

আবার সেই যুদ্ধজিগির!

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

তখন কিছু প্রশ্ন তোলার থাকেই। স্বাধীনতা'র পরে ষাট বছরে কঠোর থেকে কঠোরতম আইনের আমদানি করেও তো একটুও কমেনি সমস্যাটা। বরং বেড়েইছে, বেড়েছে আক্রমণের ধরণ, সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ। আর সত্যি করে ভাবুন তো, কিছু বিপথগামী ভুল দিশায় চালিত যুবশক্তি যখন নিজেদের মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে এসে এমন কাণ্ড ঘটাচ্ছে, সেটা শুধু আইন আর নিরাপত্তার ঘেরাটোপ দিয়ে আটকানো সম্ভব?

গোটা সমস্যাটা আরও বাড়বে কারণ ভারত আমেরিকার কৌশলগত সহযোগী হয়ে উঠেছে। পরমাণু চুক্তি, যৌথ সামরিক মহড়া, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিশ্বযাত্রায় সঙ্গে যাবে কে? অমনি কোমর বেঁধেছে ভারতের শাসকশ্রেণী। তারাও থাকবে। তারা কঠোর আইন আনবে—সেনা সাজাবে—যুদ্ধজিগিরের পুতুলনাচে সুতলির সাথে উঠবে বসবে—একটা পুলিশরাষ্ট্র বানানোর দিকে নিয়ে যাবে আমার মাতৃভূমিকে।

তারই মধ্যে আমেরিকার ইচ্ছায়, দুই দেশের শাসকশ্রেণীর বদান্যতায় চলছে যুদ্ধজিগির। কাশ্মীরের পুঞ্চে ক'দিন সীমান্তযুদ্ধ চললো। যুদ্ধ বলা যাবে না, গুলি বিনিময়। কোনো হতাহতর খবর নেই, কোনো অনুপ্রবিষ্ট সেনার খবরও পাওয়া যায়নি। ওদিকে এরই মধ্যে পাকিস্তানেও বিস্ফোরণ ঘটেছে, দুজন ভারতীয়কে ধরা হয়েছে, কদিন আগে ইসলামাবাদের ম্যারিয়ট হোটেলের ভয়াবহ বিস্ফোরণও আমরা ভুলিনি। ফলে এই যে জেহাদী সন্ত্রাসের সমস্যাটাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ না করে গোটা ব্যাপারটাকে শুধুমাত্র একটা যুদ্ধজিগিরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কুঅভ্যাসটা

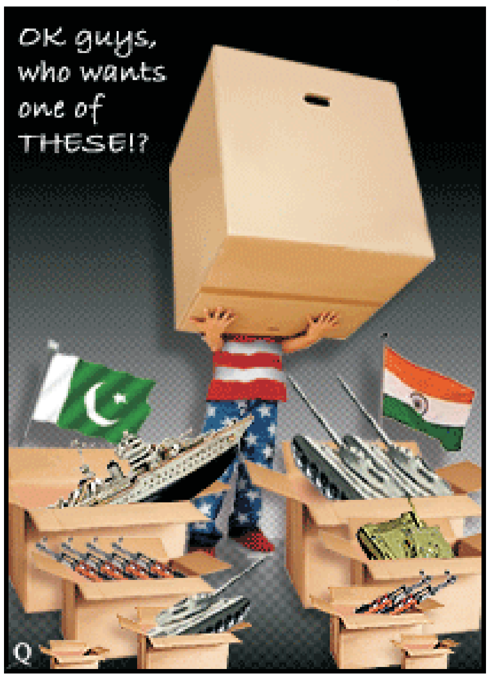

আবার দেখছি আমরা। এক কাসভের গোপন কয়েদ থেকে বেরিয়ে আসা 'স্বীকারোক্তি'গুলোর ওপর দাঁড়িয়ে চলছে একের পর এক হুমকি ভারতের তরফে আর ততোধিক নির্বোধ প্রত্যুত্তর আসছে পাকিস্তান শাসকদের তরফে। আর এই মওকায় হাসছে আমেরিকা। তাদের হয় যুদ্ধ বাঁধিয়ে অস্ত্র বেচে লাভ, আর নয়তো ভারতকে যুৎসই স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার করে তুলতে পারার লাভ। তাদেরই বিচরণক্ষেত্র বাড়বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।

কিন্তু আমরা কি বসে দেখবো? দাবার বোড়ে হয়ে থাকবো আমেরিকা-ভারত-পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী আর তাদেরই কারোর না কারোর মদতপুষ্ট জঙ্গীগোষ্ঠীর? বিকল্প একটা রাস্তা তো আছে— গণআন্দোলনের, শ্রমিকশ্রেণীর তথা মেহনতী মানুষের প্রতিরোধের। ওদের অস্পষ্ট, কায়েমী স্বার্থবাহী জেহাদের বদলে অন্য জেহাদ দেখাক বিশ্ব জনগণ। আমেরিকা আর তার যুযুধান প্রতিপক্ষ এই জেহাদিরা আমাদের ভুলিয়েই দিয়েছে যে পাকিস্তান কিংবা ইরাকে, আফগানিস্তান কিংবা বাংলাদেশে এক অন্য ধারাও আছে— সে ধারা মেহনতী মানুষের প্রতিরোধের—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সপক্ষে সেখানে আজও লাখো মানুষ দাঁত কামড়ে প্রতিরোধ গড়ছে। মুনতাজের আল জাইদির মুক্তির দাবীতে, মুম্বই সন্ত্রাসের জন্য দায়ী জঙ্গী গোষ্ঠী আর আমেরিকার বিরুদ্ধে, ভারত-পাক শাসকদের অপদার্থতা আর যুদ্ধজিগিরের বিরুদ্ধে আস্তিন গোটাতে হবে আমাদেরই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে সঠিক রূপ দিতে না পারলে অন্ধকারে নখ-দাঁত বাড়বে এই তথাকথিত জেহাদিদেরই, স্বস্তিতে বেঁচে থাকবে সাম্রাজ্যবাদ।

সংকট কবলিত বিশ্ব পুঁজিবাদ

চন্দন দেবনাথ

‘পুঁজিবাদের স্বর্গরাজ্য’ বলে যার পরিচয়, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিনান্স বাজারে সাম্প্রতিক ধসের কারণ যতটুকু জানা গেছে, তাতে কাহিনীটা এরকম : বাড়ি কেনার জন্য ব্যাঙ্কগুলো দেদার লোন দিয়ে গেছে। অবশ্যই বাড়িগুলোকে বন্ধক রেখে। নিশ্চিন্ত মনে দেদার লোন দিতে পারার কারণ হল, লোন ফেরৎ পাবার কোনও চিন্তা তাদের ছিল না। কারণ লোন দেবার পর ব্যাঙ্ক সেই লোনগুলো সামান্য লাভ রেখে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক নামে এক ধরনের আর্থিক সংস্থাকে বিক্রি করে দেয়। এবার লোন আদায়ের দায়িত্ব তাদেরই। এবার ঐ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কগুলো প্রদত্ত লোন ও তার ইনটারেস্ট আদায়ের জন্য আর এক ধরনের আর্থিক সংস্থাকে নিয়োগ করে কিছু কমিশনের বিনিময়। তারপর কোনও বিমা কোম্পানিকে দিয়ে লোনগুলোকে বিমাও করিয়ে নেয়। অর্থাৎ বিমা কোম্পানিকে নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়ে এটা নিশ্চিত করে নেয় যে, লোন আদায় না হলে ইনটারেস্ট সমেত লোনের টাকা বিমা কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া যাবে। এর পর ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কগুলো ঐ লোনগুলোকে বিশ্বব্যাপী ছড়ানো বিভিন্ন বিনিয়োগকারির কাছে বিক্রি করে দেয়। চিন্তা না থাকায় প্রথমোক্ত মূল ব্যাঙ্কগুলো এমন সব ব্যক্তিকেও লোন দিতে শুরু করে, যাদের লোন শোধ করার ক্ষমতাই আসলে ছিল না। এমনকী লোন নিতে আকৃষ্ট করার জন্য সুদের হারও কমিয়ে দেওয়া হয়। সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন এক সাথে অনেকেই লোন শোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এদিকে ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা দেখে বাড়ির জোগানও ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। ফলে বাড়ির দামও পড়তে শুরু করেছে। একসঙ্গে প্রচুর মানুষ লোন শোধ দিতে অসমর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিমা কোম্পানিগুলো ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কগুলোর সাথে চুক্তি মোতাবেক তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কগুলো তাদের বিনিয়োগকারিদের পাওনা মেটাতে বন্ধকী বাড়িগুলো বিক্রি করতে শুরু করে। ফলে বাড়ির দাম আরও পড়তে থাকে। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কগুলো এবার একে একে দেউলিয়া হতে শুরু করে। ফলে যে সব বিনিয়োগকারী এই ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কগুলোতে বিনিয়োগ করেছিল, তারা সবাই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিণাম সহ্য করতে না পেরে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেন, এমন খবরও আছে।

মার্কিন ফিনান্স ব্যবসার জগতে এই বিপুল বিপর্যয়ের মোকাবিলায় বুশ সরকার যে বিশাল পরিমান ত্রাণ তহবিলের ব্যবস্থা করেছে, তাতে শেয়ার বাজার চটজলদি চাঙ্গা হবে কিনা, তাতে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরবে কিনা, তা নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞই সংশয় ব্যক্ত করছেন। এ ব্যাপারে মার্কিন ট্রেজারির ঘরোয়া ফাইনান্স বিষয়ক আণ্ডারসেক্রেটারি অ্যান্টনি রায়ানের এই মন্তব্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ : “আমাদের পায়ের তলায় মাটি কম্পমান। দেশের সম্পত্তি এবং ১১ লক্ষ কোটি ডলারের মর্টগেজ বাজারের সংকট বিশ্ব জুড়েই ফিনান্স বাজারের আস্থা টলিয়ে দিয়েছে। এই সংকটের মোকাবিলায় তাই বিশ্ব জুড়েই সংহত প্রয়াস চাই।” ‘সংহত প্রয়াস’-এর কথাটা বলা হয়েছে এই কারণে যে, সংকট কেবল মার্কিন অর্থনীতিতেই নয়, পুঁজিবাদের আর এক ঘাঁটি পশ্চিম ইউরোপও আক্রান্ত। দেউলিয়া হয়ে পড়ছে একর পর এক ব্যাংকিং ও বিমা সংস্থা। তাদের বাঁচানোর জন্য সেখানেও সরকারের পক্ষ থেকে বিশাল বিশাল পরিমাণের ত্রাণ তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া বাজারে নগদ টাকার জোগান বাড়াতে আমেরিকা ও ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলো সুদের হার কমানোরও রাস্তা নেয়। জি-৭ ভুক্ত দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীরা জরুরি বৈঠকে বসে সংকট মোকাবিলায় ‘সমস্ত উপায়’ গ্রহণের অঙ্গিকার নেন। এমনকী ব্যাংকিং ব্যবস্থার আংশিক রাষ্ট্রায়ত্ত-করণের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।

এত কিছু করেও সংকটমুক্ত হওয়া যাবে কিনা সেই সংশয় কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। সংশয় ব্যাক্ত করছেন পুঁজিবাদের প্রবক্তারাই। নিজেরাই বলে ফেলছেন, পুঁজিবাদ এক ভয়ঙ্কর সংকটে আক্রান্ত, যা গত শতকের ত্রিশের দশকের মহা মন্দার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। এতো দিন যাঁরা আর্থিক উদার নীতির প্রবক্তা ছিলেন, তাঁদেরই একাংশ এমনকী এমনও বলত শুরু করেছেন, ‘ঠান্ডা যুদ্ধের’ অবসানের পর পশ্চিমী দুনিয়া অতি উৎসাহে যে রাষ্ট্রীয় লাগামহীন পুঁজিবাদের ওকালতি শুরু করেছিল, এবং প্রায় তিন দশক ধরে যা চলল, আজ তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়েছে। এমনকী আনন্দবাজার পত্রিকা-র মতো আর্থিক উদারিকরণের প্রবল প্রবক্তার কণ্ঠেও এখন নরম সুর। ২৬/১১/২০০৮-এর সম্পাদ-কীয়তে আমরা পেলাম এই প্রশ্ন :“এই সংকট সৃষ্টি হইল কেন?” এবং তার এই উত্তর :“আর্থিক ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন ছিল। বাজার শক্তিমান, কিন্তু তাহার লাগাম ছাড়িয়া দিলে যে সেই শক্তি ভুল পথে চালিত হইতে পারে, বর্তমান আর্থিক সংকট তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।”

বাজার সংকটে পড়ল কেন, তার একটাই উত্তর সবার থেকে আমরা পাচ্ছি : ফিনান্স বাজারের উপর যথোপযুক্ত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না, আর সেই সুযোগ ফিনান্স কারবারের কর্তাব্যক্তিরা অতি মুনাফার লালসায় বেপরোয়া ফাটকাবাজি চালিয়ে গেছে, যার পরিণামই এই সংকট। অভিরূপ সরকার যেমন লিখেছেন, জরুরি নিয়ন্ত্রণগুলো থাকলে শেয়ার বাজারে এই ধস নামতো না। (আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৬ অক্টোবর, ২০০৮) মজার কথা হল, আমাদের এখানকার ‘বামপন্থী’ বুদ্ধিজীবীদের কথাও তাই। যেমন জয়তী ঘোষের এই কথা : ফিনান্স কোম্পানিগুলোর কর্তাব্যক্তিদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং লাগামছাড়া লালসাই এই সংকটের জন্য দায়ি। (ফ্রন্টলাইন : ১০ অক্টোবর, ২০০৮) সংকটের মোকাবিলায় বুশ সরকার যে ত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন, সে সম্পর্ক তাঁর বক্তব্য হল, এর মাধ্যমে ঐ কর্তাব্যক্তিদের দোষকেই আসলে মাফ করে দেওয়া হল, অথচ উচিত ছিল তাদের শাস্তি পাওয়া। সংকটের ধাক্কায় উদার অর্থনীতির প্রবক্তাদের সাম্প্রতিক নরম সুরের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এত দিন যাঁরা বাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় খবরদারির বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি সরব ছিলেন, এখন উদ্ধারকল্পে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনের দাবিতে তাঁরাই দেখা যাচ্ছে বেশি সোচ্চার।

একই রকম কথা প্রভাত পট্টনায়কেরও : “সংকটের মূল কারণ নিহিত আছে ফিনান্স বাজারের লাগামহীন কার্যকলাপের মধ্যে।” (ফ্রন্টলাইন : ৭ নভেম্বর, ২০০৮) আর ভারতের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন এই সংকট ততটা গ্রাস করতে পারেনি, তার কারণ হিসাবে যে যুক্তি তিনি দিয়েছেন, তা হল, ‘বামপন্থীদের চাপ’ আর্থিক উদারিকরণের প্রচেষ্টাকে এখানে কিছুটা হলেও রুখে দেওয়া গেছে। বস্তুত ঐ লেখাতে পট্টনায়ক যতোই বলুন, কেইন্স ছিলেন একজন সমাজতন্ত্র বিরোধী, পুঁজিবাদের পক্ষধারী, লেখা থেকেই স্পষ্ট যে তিনি নিজেই আসলে কেইন্সীয় মডেলের একজন পূজারি। যে কেইন্সের অভিমত ছিল, পুঁজিবাদের রক্ষার্থেই বাজারের উপর, বিশেষ করে ফিনান্স বাজারের উপর, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকাটা জরুরি, যাতে ‘পূর্ণ নিয়োগ’ (full employment) অর্জনের লক্ষ্যে প্রকৃত অর্থনীতিতে যথেষ্ট রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হয়। পট্টনায়কের ভীষণ রাগ এবং আক্ষেপ যে, আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির স্বার্থে পশ্চিমী দুনিয়া কেইন্সীয় মডেল পরিত্যাগ করে ফিনান্স কারবারিদের যথেচ্ছাচারের সুযোগ করে দিয়ে এই দুর্যোগ ডেকে এনেছে। আর আজকে নেহাত বিপাকে পড়েই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শুরু করেছে। তাঁর ভাবখানা এমন, এমন কথা তো আমরা বরাবরই বলে আসছি, অথচ আমাদের কথায় এতোদিন কর্ণপাত করা হয়নি। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, পুঁজিবাদে রাষ্ট্রীয় লাগাম পরানোর এই দাবির মধ্যে সত্যিই কি সমাজতন্ত্রের প্রতি কোনও আনুগত্য প্রকাশ পায়, নাকি এ হল আসলে পুঁজিবাদকেই স্থিতিশীল রাখার এক আকুতি মাত্র? কোনও সন্দেহ নেই যে, এটা পুরদস্তুর একটা সংস্কারবাদী দাবি, যেখানে সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের ছিটেফোটাও নেই। কেননা পুঁজিবাদের বিনাশ ঘটানার আকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, পুঁজিবাদের হিতার্থেই এই দাবি উঠে আসছে। তবু বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনও ‘বামপন্থী চাপ’ নয়, প্রয়োজন বুঝে উদার অর্থনীতির প্রবক্তাদের একাংশ নিজেরাই এখন ফিনান্স ব্যবসার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ লাগু করার কথা বলতে শুরু করেছে। আর এক অংশ যদিও এখনও উদার নীতি থেকে সামান্যতম পশ্চাদপসরণেও নারাজ। প্রথমাংশের আশঙ্কা হল, লাগামহীন পুঁজিবাদ নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। আর এই আশঙ্কার পেছনে আছে বিশষজ্ঞদের এই অভিমত যে, গত শতকের ত্রিশের দশকের ‘মহা মন্দা’র পেছনেও ছিল বিশের দশকের লাগামহীন পুঁজিবাদের ভূমিকা। তবে দ্বিতীয় এক মহা মন্দা বিশ্ব পুঁজিবাদকে আবার নতুন করে গ্রাস করবে কিনা, সেটা অবশ্য পুঁজিপতিদেরই মাথাব্যথার বিষয়, শ্রমিকশ্রেণীর নয়। কেননা শ্রমিকশ্রেণী কখনও পুঁজিবাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করতে পারে না। যদিও এটা সত্যি যে, পুঁজিবাদের আজকের এই নড়বড়ে অবস্থা সত্ত্বেও তাকে খতম করে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে পদক্ষেপ ফেলার মতো অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী এই মুহূর্তে একেবারেই নেই। কিন্তু তাই বলে ফাটকা কারবারে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ লাগু করার সংস্কারবাদী দাবি শ্রমিকশ্রেণীর দাবি হতে পারে না। এ জাতীয় দাবিতে শামিল হওয়ার অর্থ হল শ্রেণী চেতনার অবক্ষয় ঘটানো। বস্তুত বিগত মহা মন্দা থেকে শিক্ষা নিয়ে পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলোতে যে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও ‘জনকল্যানমূলক’ রাষ্ট্র প্রবর্তন করা হয়েছিল, তার ছত্রছায়ায় আপাত নিরাপত্তায় থাকতে থাকতে শ্রমিকশ্রেণী তার শ্রেণীসংগ্রামের মেজাজ ও শ্রেণী চেতনা অনেকটাই খুইয়ে বসেছিল। আর তার পর ‘সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া’ ও সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার মধ্যে চলমান দীর্ঘ ‘ঠান্ডা যুদ্ধের’ অবসানের পর বিশ্বায়নের জমানা যখন শুরু হল, শ্রমিকশ্রেণী অনেক মূল্য দিয়ে তখন বুঝল, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের জমানার ‘সামাজিক নিরাপত্তাটা’ ছিল নিছকই একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা — এটাকে দীর্ঘ দিন টেনে চলা হয়েছে প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের তখনও পতন ঘটানো যায়নি বলে। আর যখন সেটা সম্ভব হল, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের শেষ আবরণটুকুও ছুড়ে ফেলে লাগামহীন উদারিকরণের পথে যাত্রা শুরু করা হল।

এই ইতিহাস এখন সর্বজনস্বীকৃত। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ এবং লাগামহীন পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদের এই দুই রূপই ইতিহাস দেখে নিয়েছে। এবার কী হয় সেটাই দেখার। তবে গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে, সংকট যতোই গভীর হোক না কেন, ঠিক আগের মতোই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে ফিরে যাবার সম্ভাবনা এই মুহূর্তে নেই। তার বড় কারণ হল, সাম্রাজ্যবাদের কোনও বিপদ এই মুহূর্তে নেই, যেমনটা হাজির ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়, চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে। তবু বাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষপ ও নিয়ন্ত্রণ খানিকটা বাড়ানো নিশ্চয় হবে। এবং সেটা নিরূপায় হয়েই। কিন্তু হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের মাত্রা যেমনই হোক না কেন, সংকট কিন্তু পুঁজিবাদের পিছন ছাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ সংকট আসলে পুঁজিবাদের একেবারে শেকড়েই।

আমাদের ফিনান্স বাজারের ধসটুকুই শুধু বড় করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু ওরা যাকে বলে ‘রিয়াল ইকনমি’ বা ‘প্রকৃত অর্থনীতি’, যেখানে আমরা পাই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদিত পন্যের বাজার, তার অবস্থাও তো ভালো নয়। সেখানেও মন্দা শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই জাতীয় উৎপাদন নিম্নমুখী। কারণ বাজারে চাহিদার অভাব। আর চাহিদার অভাবের পেছনে কারণ হল, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। স্বভাবতই উৎপাদন বিনিয়োগও নিম্নমুখী এবং তার সাথে সঙ্গতি রেখে শুরু হয় গেছে একের পর এক কোম্পানিতে কর্মী ছাঁটাইয়ের পালা । গত সেপ্টেম্বরে কাজ হারিয়েছেন ৪,৩৩,০০০ জন, অক্টোবরে ৩,২০,০০০ জন, নভেম্বরে ৫,৩৩,০০০ জন, ডিসেম্বরে ৫,২৪০০০ এবং গত বছরে মোট কাজ হারিয়েছেন ২৬ লক্ষ মানুষ। এবং বেকার সংখ্যা এখন এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এর পর যুক্ত হয়েছে দানবীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপের পতন এবং পরিণামে সেখানেও ব্যাপক ছাঁটাই অভিযান।

কিন্তু এই চিত্র শুধু মার্কিন অর্থনীতিতেই নয়, গোটা বিশ্বেই এখন এই চিত্র। এমতাবস্থায় সম্প্রতি ওয়াশিংটনে জি-২০ জোটভুক্ত এক বৈঠক হয়। বৈঠকের লক্ষ্য ছিল, যে অর্থনৈতিক সংকট বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, তার সমাধান করা এবং ভবিষ্যত এই সংকটের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করা। বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলির নেতারা একমত হয়েছেন যে, এই সংকট থেকে পরিত্রাণের প্রথম উপায় হল রাজস্ব খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা। গত শতকের ত্রিশর দশকের মহা মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেইনার্ড কেইন্স যে উপায় উদ্ভাবন করছিলেন, বর্তমান সংকটে নেতারা সেই উপায়েরেই শরণাপন্ন হন। মন্দার প্রধান লক্ষণ হল, বাজারে চাহিদার সামগ্রিক হ্রাসপ্রাপ্তি। সুতরাং মন্দা কাটাতে হলে চাহিদা বাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হয়। কিন্তু তাহলে তো জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হয়। আর সেটা করতে হলে কর্মরতদর মজুরি বাড়াতে হয়, কর্মহীনদের কাজে নিয়োগ করতে হয়। আর সমস্যা তো এখানেই। এই রাস্তা নিলে তো পুঁজির মুনাফায় টান পড়বে। সংকট এখানেই। পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগের সংকট। সুতরাং বিকল্প হল, সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে বাজার চাহিদা বাড়ানো। আশা হল, সরকার ব্যয় বাড়ালে অর্থনীতিতে ফের টাকার জোগান বাড়বে, মানুষের হাতে টাকা আসবে, ক্রেতাদের চাহিদা বাড়বে, উৎপাদনে বিনিয়োগও বাড়বে। এটাই ছিল মন্দা মোচন কেইন্সীয় দাওয়াই। জি-২০ জোটের বৈঠকে সেই পন্থা নেওয়ারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

মজার কথা হল, আমাদের সরকারি বামপন্থীরাও আসলে এই একই দাওয়াইয়ের কথা বলছেন। যেমন, সম্প্রতি প্রমোদ দাসগুপ্ত ভবন সি পি আই (এম) পার্টির এক জমায়েতে সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, বিপাকে পড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কগুলোর উদ্ধারকল্পে সরকারি ত্রাণ তহবিলের ব্যবস্থা করে কোনও লাভ হবে না, যদি না জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানা যায়। আর সেটা করতে হলে সরকারকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। প্রশ্ন হল, এটাও কি সেই কেইন্সীয় দাওয়াই নয়?

কিন্তু সংকট মোচনে যে পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, সংকট আসলে পুঁজিবাদের একবার অস্থি মজ্জায়। সংকট থেকে সাময়িক স্বস্তি হয়তো পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সংকট থেকে চিরতরে মুক্তির কোনও সম্ভাবনাই আর নেই। আসল সমস্যা হল, পুঁজিবাদী উৎপাদনে পুঁজির লাভজনক বিনিয়াগের রাস্তা সংকুচিত হয়ে আছে। অথচ গোটা বিশ্ব জুড়ে পুঁজির সুবিশাল একটা পাহাড় তৈরি হয় আছে। কিন্তু চাইলেও সেখান থেকে যথেচ্ছ পরিমাণ পুঁজি উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়াগ করা আর সম্ভব নয়। কারণ শুধু বিনিয়োগ করলেই তো চলবে না, উৎপাদিত পন্যকে বাজারে লাভজনক দরে বিক্রিও করতে হবে। এখানেই তো সমস্যা। বাজার তো অনন্ত নয়, যে বিক্রিবাটার কোনও সমস্যা নেই। বাজার সীমিত। তাকে ইচ্ছেমতো টেনেটুনে প্রসারিত করা যায় না। আর জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে বাজার বাড়ানোর পদ্ধতিরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। জনগণের একটা বড় অংশই তো পুঁজির মজুরি দাস, মজুরিজীবী শ্রমিক। মজুরি না বাড়লে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে কী করে? কিন্তু মজুরি বাড়ালে তো মুনাফায় টান পড়বে। শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে পুঁজিপতিরা কি তাদের মুনাফার স্বার্থে কিছুটা হলেও ত্যাগ করতে রাজি হবে? এটা হবার নয় বলেই সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে বাজার বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তাতেও কি পুঁজির সমস্যা মিটবে?

পুঁজির অন্তর্নিহিত তাগিদ হল অনবরত আত্মপ্রসার ঘটানো। আর পুঁজির আত্মপ্রসার ঘটে আসলে পুজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে, শ্রমিকদের উৎপাদনশীল শ্রম শোষণ করে উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের মধ্যে দিয়ে। বিশ্ব জুড়ে পুঁজির পাহাড় ক্রমশ বাড়ছে এই পথেই। কিন্তু বাজারের সীমাবদ্ধতার কারণ এই বর্দ্ধিত পুঁজির খুব সামান্য অংশই এখন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করা সম্ভব। এই দিক থেকে দেখলে বাজারে পুঁজি আসলে উদ্বৃত্ত হয় পড়ছে। আজ হঠাৎ করে নয়, শতাধিক বছর আগে থেকেই উদ্বৃত্ত পুঁজি তার আত্মপ্রসারের সমস্যায় ভুগছে। আর সেই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে একে অপরের বাজার বলপূর্বক দখলের হিংস্র প্রয়াসও চলছে। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয় গেছে। কিন্তু সমস্যা থেকেই গেছে। বরং দিন দিন আরও গভীর হয়েছে। কারণ উদ্বৃত্ত পুঁজির পাহাড়ও তো ক্রমাগত বাড়তে থেকেছে। বস্তুত পুঁজির স্বল্পতা নয়, পুঁজির বাড়বাড়ন্তই হল আজ পুঁজিবাদী সংকটর আসল কারণ। এমতাবস্থায় এই উদ্বৃত্ত পুঁজিই ফিনান্স পুঁজির চরিত্র ধারণ করে ফাটকা কারবারে লিপ্ত হয়। ফাটকাবাজি নিয়ে এখন এতো কথা হচ্ছে। অথচ ফিনান্স পুঁজির আত্মপ্রসার ঘটাতে হলে ফাটকাবাজির আশ্রয় নিতেই হবে। ফিনান্স পুঁজি হল চরিত্রগত ভাবেই সুদখোরি পুঁজি। আর সুদ হল শ্রমোৎপন্ন উদ্বৃত্ত মূল্যেরই একটা অংশ। এখানেই প্রকৃত অর্থনীতির সাথে ফিনান্স বাজারের সম্পর্ক। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোনও অংশ না নিয়েই, শুধুমাত্র পুঁজির জোগান দিয়েই প্রকৃত অর্থনীতিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ আত্মসাৎ করাই ফিনান্স পুঁজির কাজ। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির জনৈক প্রফেসর এবং আই এম এফ-এর একজন প্রাক্তন মুখ্য অর্থনীতিবিদ

শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায়

Declaration No. 178/04; 18.11.04

ব্রিটেনের শ্রমিকদের বেতনহীন শ্রম

ব্রিটেনের ৫০ লক্ষ শ্রমিকগত বছর রেকর্ড পরিমান ভূতের বেগার খেটেছেন। তাঁদের মোট বেতনহীন শ্রমের পরিমাণ ২৬.৯ বিলিয়ন পাউন্ড, যা ১৯৯২ সালের পর একটা রেকর্ড। সেখানকার ট্রেড ইউনিয়নগুলির দাবী, যে পরিমাণ শ্রম শ্রমিকরা ওভারটাইমে দিয়েছেন, তাতে তাঁদের এক একজনের ৫০০০ পাউন্ড করে পাওয়ার কথা। এর মধ্যে লন্ডন, ইস্ট মিডল্যান্ডস, ও পূর্ব ইংল্যান্ডের শ্রমিকদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। তারা গড়ে আগের চেয়ে প্রতি সপ্তাহে সাত ঘন্টা করে বেশী খেটেছেন। এই হিসেব বলছে যদি মোট বেতনহীন শ্রম হিসেব করা যায়, তাহলে তার পরিমান দাঁড়াবে শ্রমিকপিছু প্রায় দুমাসের কর্মদিবসের সমান।

অটোমোবাইল শিল্পে ব্যাপক মন্দা, ছাঁটাই

আমেরিকার গাড়ি বা অটোমোবাইল শিল্পে অভূতপূর্ব মন্দার জেরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক প্ল্যান্টের উৎপাদন। সামগ্রিকভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে উৎপাদনের হার গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে টয়োটার উৎপাদন এবার সর্বনিম্ন, এবারই তারা প্রথম ক্ষতির হিসাব গুনছে। ক্রাইসলার তার সম্ভাব্য দেউলিয়া হওয়ার মুখে এক মাসের জন্য তার উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করেছে। হোয়াইট হাউস ও মার্কিন কংগ্রেস ক্রাইসলার ও জেনারেল মোটর্সকে তাদের ধস রুখতে ১৫ বিলিয়ন ডলার লোন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। মন্দার আঘাত নেমেছে কানাডাতেও। অন্টারিওর সরকার জানিয়েছে যদি ডেট্রয়েটের তিনটি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কাজ হারাবেন কানাডার পাঁচ লক্ষ শ্রমিক। জার্মানীর তিনটি বড় গাড়ির যন্ত্রাংশ কোম্পানী টিএমডি ফ্রিকশন, টেড্রাইভ জার্মানী ও ওয়াগন অটোমোটিভ নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। ওপেলের শ্রমিকরাও পথে বসেছেন তাদের বোচামের প্ল্যান্ট বন্ধ হওয়ার পর। ওদিকে জার্মানীর উত্তর অংশে এইচ ডব্লু ইউ নামক যন্ত্রাংশ কোম্পানী দেউলিয়া ঘোষণার পর সেখানকার শ্রমিকরা ঐ কারখানার দখল নিয়েছেন। ভারতের রুদ্রপুরে হন্ডা-সিয়েল প্ল্যান্টের শ্রমিকরা কারখানা ঘেরাও করে যন্ত্রাংশ পাচার আটকাচ্ছেন। মালিকরা ঐ কারখানা সরিয়ে স্পেশাল ইকনমিক জোনে নিয়ে যেতে চায়।

আন্দোলনে উত্তাল গ্রীস

গ্রীসের দক্ষিণপন্থী সরকার পড়েছে বেজায় বেকায়দায়। ৬ই ডিসেম্বর পুলিশের গুলিতে ১৫ বছরের কিশোর আলেক্সান্দ্রজ গ্রিগোরোপৌলস-এর মৃত্যুর পর সারা দেশ জুড়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে জনতা। সমাজ জুড়ে ক্ষোভগুলোর সমস্ত বহিঃপ্রকাশ যেন এসে পড়েছে প্রকাশ্যে, এই পুলিশী গুলিচালনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। স্কুল ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে যাচ্ছে থানার দিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের ফ্যাকাল্টি দখল করে নিচ্ছে, বাজেট বিতর্কের দিন শ্রমিকরা সামিল হচ্ছে ধর্মঘটে, জনতা সামিল হচ্ছে বিশাল সব মিছিলে, আর পুলিশ এলে সবাই হাতে হাত ধরে পুলিশকে দুর দুর করে তাড়াচ্ছে— এসবই গত মাসখানেক ধরে গ্রীসের নিত্যদিনের ছবি হয়ে উঠেছে। ১২ই জানুয়ারীতে এক বিশাল গণজমায়েতের প্রস্তুতি চলছে সেখানে, ১৯৯০ সালের ঐ দিনটিতে এক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী খুন হয়েছিলেন দক্ষিণপন্থীদের হাতে। এবার অবশ্য তার সাথে জুড়বে আলেক্সান্দ্রজের নাম।

এই আন্দোলনের ভিতরের শক্তিকে বুঝতে গেলে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। গ্রীসের সংসদীয় বাম পার্টি পেসক পার্টি এবং দক্ষিণপন্থী পার্টি নিউ ডেমোক্রেসী পার্টি, দুদলেরই কারবারে জনতা বিরক্ত। এতাবৎকালের সর্ববৃহৎ স্ট্রাইকটি হয় ২০০১ সালে, যার ফলে

তৎকালীন পেসক সরকার তাদের শ্রমিকদের পেনশনে সংস্কার সংক্রান্ত কর্মসূচীটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের এই জয় নতুন উৎসাহ যোগায়। সে বছরই জেনোয়াতে জি-৮ বিরোধী বিক্ষোভে গ্রীসের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল অভূতপূর্ব। ২০০৩-এ ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধেও সেখানে একের পর এক কর্মসূচী চলে। স্কুল ছাত্রছাত্রীরা সেখানে দারুণ ভূমিকা নেয়।

২০০৪-এর নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় আসে। সংসদীয় বামদের আত্মসমর্পণের রাজনীতির বিরুদ্ধে, দক্ষিণপন্থীরা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেয়, এবং দিগভ্রান্ত জনতা তাদের জেতায়। কিন্তু অচিরেই তাদের রূপ ধরা পড়তে থাকে। নয়া উদারনীতি বলে তারা যা চালাতে থাকে, তা আসলে ব্যাপক বেসরকারীকরন এবং সরকারী ব্যয়সংকোচ। চালু হয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। আর দক্ষিণপন্থী সরকারের হাত ধরে শুরু হয় মিলিটারী তৎপরতা, বিশ্বজুড়ে 'সন্ত্রাসে বিরুদ্ধে যুদ্ধে' নেমে পড়ে তারাও, গ্রীক ট্রুপ পাঠানো হয় আফগানিস্তানে ও বলকান অঞ্চলে। গ্রীসের মানুষের মিলিটারী বিরোধী চেতনার সাথে এটা খুবই বেমানান। ক্ষোভ জমছিল অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও। সব মিলিয়ে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছিলোই। আলেক্সান্দ্রস-এর মৃত্যু সেই আগুনে ঘি মাত্র।

গাজায় ইজরায়েলী হানা

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

চালিয়ে গেছে। মানচিত্রে ছোটো একফালি দেশ 'গাজা'; যার দুদিকের সীমানায় আছে ইজরায়েল, একদিকে রয়েছে সাগর আর অন্য একদিকের ছোটো একটা অংশ 'ইজিপ্ট'-এর সাথে যুক্ত। দেশটির নিজস্ব কোস্ট ব্যবহার করার কোনো অনুমতি নেই, 'গাজা'র আকাশ ইজরায়েল-এর নিয়ন্ত্রনে এবং সর্বোপরি দেশটির ইজরায়েল-এর অনুমতি ভিন্ন অন্য দেশের সাথে বাণিজ্যের অধিকার পর্যন্ত নেই। ইজরায়েলী প্রিসিশন মিসাইল 'গাজা'র ঘনবসতি পূর্ণ অঞ্চল, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, বাজার গুলো লক্ষ করে আছড়ে পড়ে। ইজরায়েলী হাবভাব হলো সুযোগ পেলে 'গাজা'

দেশটিকে মানচিত্র থেকে মুছে দেয়। ইউনাইটেড নেশন্স এর সাথে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী 'গাজা'-র অন্তর্গত অঞ্চলের প্রায় অর্ধেকের বেশী অঞ্চল ইজরায়েল দখল করে রেখেছে সেই '৬৭ সাল থেকে। গত ২৭ শে ডিসেম্বর ইজরায়েল তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'গাজা'য়, যে দেশটির জনসংখ্যা ১৫লক্ষ এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এখনো পর্যন্ত জানা খবরে মৃতদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ হলো সাধারণ মানুষ। এইরকম একটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে যেখানে সারা দেশটাকেই যুদ্ধাঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে এবং মার্কিন মদতপুষ্ট একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র নির্বিচারে হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে। সন্ত্রাস দমনের নামে সাধারণ মানুষের উপর এই বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বণিত হচ্ছে সারা বিশ্বজুড়ে। আমেরিকার মত একটি দেশের সাথে মিত্রতামূলক সম্পর্ক নিয়ে চললে তাকে আমেরিকার হয়ে কী ভূমিকা পালন করতে হয় তা গাজা প্রশ্নে ইজরায়েলের ভূমিকা থেকেই আবার প্রকট হয়ে উঠছে। ভারতের আমেরিকার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হয়ে ওঠা, ফলত ইজরায়েলের সাথেও নানারকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার বিরুদ্ধে এবং এই হানার বিরুদ্ধে প্রয়োজন সর্বতো প্রতিবাদ গড়ে তোলা।

ঘৃণার জুতো বুশকে!

জুতো ছোঁড়ার 'অপরাধে' ধৃত মুনতাজের আল জাইদির মুক্তির দাবীতে সরব স্বাধীনতাকামী জনতা।

চিকাগোতে কারখানা দখল শ্রমিকদের

শুভরূপ সাহা: আমেরিকার শিকাগো শহরে কিছুদিন আগে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। গত ৫ই ডিসেম্বর মাত্র তিন দিনের নোটিশে রিপাবলিক ডোরস এন্ড উইনডোস নামক একটি কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার কথা ঘোষনা করে কর্তৃপক্ষ । এই কারখানাটিতে প্রায় তিনশো কর্মী তাপমাত্রা-সংরক্ষণকারী (শীত প্রধান দেশে জরুরি) জানালা-দরজা বানাত। কারখানাটি চালানোর মতন মূলধনী-ঋণ (যা আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক - ব্যাংক অব আমেরিকা হঠাৎই দিতে অস্বীকার করে) না থাকাই নাকি এই সিদ্ধান্তের কারণ। এমনকি তারা শ্রমিকদের বকেয়া বেতনও দিতে অস্বীকার করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কারখানার শ্রমিকরা তাদের ইউনিয়ন - ইউ ই লোকাল ১১১০ - এর নেতৃত্বে কারখানাটির দখল নিয়ে নেয় এবং ততক্ষণ অবস্হান চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় যতক্ষণ না সরকারী নিয়ম অনুযায়ি তাদের যাবতীয় পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং কারখানাটি আবার চালু করতে আশু উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঘটনাচক্রে, কিছুদিন আগেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার যে ৩৫ লক্ষ-কোটি টাকা সরকারি কোষাগার থেকে মঞ্জুর করেছিল অর্থনৈতিক বাজারকে চাঙ্গা করতে, তার থেকে ১৭,৫০০ কোটি টাকা পেয়েছিল এই ব্যাংক অব আমেরিকা। এই টাকা দেওয়ার সময় জনগণকে এটাই বলা হয় যে বাজারে ঋণের জোগান বজায় থাকলে কারখানা বন্ধ হওয়ার ও কাজ হারানোর সম্ভাবনা অনেক কমবে। অথচ, সরকারি পয়সা হজম করে ব্যাংকের মোটা মাইনে পাওয়া বাবুরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে কোম্পানীটিকে আর ঋণ দেওয়া হবে না, যার ফলশ্রুতি এই ক্লোজার।

কারখানার ভিতরে এবং বাইরে লাগাতার বিক্ষোভ-অবস্থান চলতে থাকে এবং তা এলাকার মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পায়। ব্যাংকের হেড অফিসের সামনেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। এমনকি অন্য এক রাজ্য উত্তর ক্যারোলিনার শার্লটে ব্যাংকের প্রধান দপ্তরের সামনে এই ইউনিয়নের ভ্রার্তৃপ্রতিম সংগঠন - ইউ ই লোকাল ১৫০ ধর্ণার আয়োজন করে। লড়াই চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিলও গঠিত হয় এবং টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের লড়াই প্রচার লাভ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই ইলিনয় রাজ্যের প্রায় সমস্ত বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখে, এবং কয়েক জন কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করে তাদের লড়াইকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এখানে বলা উচিত যে সংগ্রামী ইউনিয়নটি কোনো পার্টির পেটোয়া ইউনিয়ন নয়, এবং এদের নিজেদের ভাষায় -আমরা হলাম শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত ইউনিয়ন, যেখানে সিদ্ধান্ত শ্রমিকরাই নেয়; গণতন্ত্র শুধু কথার কথা নয়, আমরা তা কাজে পালন করতে পছন্দ করি।

ফল মেলে হাতেনাতে। ১২-ই ডিসেম্বর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পর ইউনিয়ন তাদের জয়ের কথা ঘোষনা করে। ৮.৭৫ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষিত হয় যা থেকে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন, ২ মাসের অগ্রিম মাইনে, জমা ছুটির সমপরিমান টাকা ও আগামী দুই মাসের স্বাস্থ্যবীমার কিস্তি মেটানো হবে। জে পি মর্গান চেজ এবং ব্যাংক অব আমেরিকা এই টাকা জোগাবে। এই টাকা কোম্পানীকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হলেও তা সরাসরি একটি আলাদা তহবিলে জমা পড়ে যাবে যাতে কর্তৃপক্ষ তা কখনই অন্য কোনো খাতে খরচ না করে ফেলে। একই সঙ্গে কারখানা পুনরায় খোলার লক্ষ্যে তৈরী করা হয়েছে সুযোগের জানালা নামক তহবিল, যাতে সারা দেশ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করা হবে।

স্বত্বাধিকারী অমিতাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১১, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক : অমৃত পৈড়া**